শরৎ-সন্দর্শন

জীবেন্দ্র সিংহরায়

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

উৎসর্গ

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন

লেখকের সমালোচনার বই

কল্লোলের কাল

কবিতার সীমানা

প্রমথ চৌধুরী

সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ [প্রথম পর্ব]

সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ [দ্বিতীয় পর্ব]

আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা [ওড]

আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা [সনেট]

মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত

শরৎ-সন্দর্শন

ভূমিকা

উনিশ শ পঁচাত্তর সালের একেবারে শেষ দিকে উনিশ চুয়াত্তর সালের শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতামালা দেওয়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আমন্ত্রণ জানান। আমি আনন্দের সঙ্গে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। শর্ত ছিলো, আমাকে কমপক্ষে তিনটি লিখিত বক্তৃতা দিতে হবে। আমি চারটি বক্তৃতা দেব বলে স্থির করি এবং সে-অনুযায়ী বক্তৃতাগুলি তৈরিও করি। কিন্তু কর্মস্থলে জরুরি কাজ থাকায় গত ১৮, ১৯ ও ২০-এ মার্চ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে তিনটি মাত্র বক্তৃতা দিই। চতুর্থ বক্তৃতাটি দিতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। বর্তমান গ্রন্থে অবশ্য চারটি প্রস্তাবই দেওয়া হলো। এই গ্রন্থ-প্রকাশ উপলক্ষে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ শরৎ-জন্ম-শতবর্ষে বিদ্বজ্জনও রসিকজনের কাছে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর অনুরাগী গবেষকবৃন্দ দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অপরাজেয় কথাশিল্পীর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি আমাদের গোচরে এসে গেছে। এখানে-সেখানে যেটুকু ফাঁক আছে তাও অচিরেই পূরণ হয়ে যাবে। সাধারণভাবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যা কিছু বলার কথা তা বলা হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। এখন বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে তাকে তলিয়ে দেখার সময় হয়েছে। 'শরৎ-সন্দর্শন'-এ আমি সে-চেষ্টাই করেছি। আমার বক্তব্য যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে এমন আশা করি না। সাহিত্য-বিচারে শেষ কথা বলে কিছু নেই, সব কথাই পরীক্ষামূলক। তবু বিভিন্ন বিষয়ে আমার মতামত যদি পাঠকদের একটুও ভাবিয়ে তোলে, তবে আমি আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

এই গ্রন্থের প্রস্তাবগুলি স্পষ্টতঃই বক্তৃতার আকারে লেখা। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ও লিখিত বক্তৃতার রীতিপ্রকৃতি এক হতে পারে না। বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আমি একটুও পরিবর্তন করি নি ; যেমনভাবে বলেছিলাম তেমন-ভাবেই প্রকাশ করলাম। তাই প্রস্তাবগুলির প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বক্তৃতার একটা ঢঙ্ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাঠকদের কোনো অসুবিধা হবে না বলেই মনে করি।

দুই

'শরৎ-সন্দর্শন'-এর বিভিন্ন বিষয় আলোচনাকালে আমি দু'জন বন্ধুর কাছ থেকে খুবই সাহায্য পেয়েছি—তাঁরা হলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ড. মৃণালকান্তি ভদ্র ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ড. সত্যব্রত দে। তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। ধন্যবাদ দিচ্ছি ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. অজিতকুমার ঘোষকে। তাঁরা তিন দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য গ্রন্থ-প্রকাশনার ব্যাপারে যে যত্ন নিয়েছেন তার জন্য তাঁকে প্রীতি জানাচ্ছি।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

শরৎ-সন্দর্শন

সংসারের অন্তেবাসী : নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার বোধ

এক

জীবনমনস্কতার প্রাথমিক শর্ত পালন করতে হয় প্রত্যেক ঔপন্যাসিককে। জীবনের যে মর্মোদ্ধার তিনি করেন, তাতে জীবনের জাগতিক চেহারা— শরীর ও মনের আদল— মূলতঃ থাকে অবিকৃত। এখানে-সেখানে শিল্পের কারুকর্ম সত্ত্বেও জীবন যে-রকম, সে-রকমই তাকে সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবনমনস্ক লেখক। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে— যেটা ছিলো বিশ্ব জুড়ে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার কাল— সেই সময়ে জীবন হয়েছিলো বৃন্তচ্যুত, নামগোত্রহীন, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। জগতের মধ্যে মানুষকে এমন পরবাসীর মতো আগে কখনও মনে হয় নি। সংসারের অন্তেবাসী এই মানুষের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কতটা পরিচয় ছিলো বলা শক্ত, তবু তার কিছু কিছু বীজ শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। সেই বীজ কতকটা নিহিত ছিলো তাঁর নিজেরই জীবনের মধ্যে।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল ছিলেন অস্থির স্বভাবের লোক, ভবঘুরে মানুষ। তিনি কিছুদিন চাকুরি করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই চাকুরি বেশি দিন বজায় থাকে নি কিংবা তা বজায় রাখার চেষ্টা তিনি করেন নি। তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, মাঝে মাঝে গল্প-উপন্যাস লিখতেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যচর্চার কোনো ধাত তাঁর ছিলো না। লেখাগুলি সম্পূর্ণ করে তা প্রকাশ করার কোনো আগ্রহ তাঁর দেখা যায় নি। এর ফলে বাস্তব জীবনে কিংবা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি।

যাঁর সামাজিক জীবন এমন অসংলগ্ন ও ছিন্নমূল তাঁর অদৃষ্টে দুঃখ ও দারিদ্র্য অনিবার্য। মতিলালও তাই সারাজীবন চরম অভাব-অনটনের মধ্যে কাটিয়েছেন। যখন আর কোনো উপায় থাকতো না তখন তিনি মাঝে মাঝেই শ্বশুরগৃহে আশ্রয় নিতেন। অন্যের আশ্রয়, হোন না কেন তিনি পরম আত্মীয়, যে-কোনো মানুষেরই আত্মসম্মান বিধ্বস্ত করে দেয়, পরনির্ভরতা মানুষের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেয়। মতিলালের ক্ষেত্রেও, অনুমান করি, তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এর পরিণামে যেমন তাঁর নিজের জীবন, তেমনি পুত্র শরৎচন্দ্রের জীবন শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে পারে নি। কম বয়সে যখন পিতামাতার আশ্রয়, আশ্বাস ও

নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি ছিলো তখন শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার কাছ থেকে তার কিছুই পান নি। তার প্রমাণ আছে তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের ইতিহাসে।

শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া শুরু হয় দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায়, শেষ হয় ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে। মাঝখানের উনিশ কুড়ি বছর ধরে তাঁকে ক্রমাগত স্কুল বদলাতে হয়েছে— সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুল, দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়, ভাগলপুর জেলা স্কুল, হুগলি ব্র্যাঞ্চ স্কুল ও তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে তিনি কেবলই ঘুরে বেড়িয়েছেন। মাঝে মাঝে লেখাপড়ায় ছেদও পড়েছে। ফলে শরৎচন্দ্রের বাহ্য ও আভ্যন্তর জীবনের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ কখনও ঘটে নি। বাল্য ও কৈশোর হচ্ছে মানুষের মানসিক গঠনের কাল। কিন্তু সেই কালটা তাঁর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হলো না। তিনি লেখাপড়ার মাধ্যমে আপন মনের সংলগ্নতাবোধ, স্ফুটন-মুখিনতা ও জীবনবিশ্বাস পুরোপুরি অর্জন করতে পারলেন না। মন যেখানে আল্‌গা থেকে যায় সেখানেও অনেক সময় কর্মের বন্ধন জীবনটাকে ধরে রাখে। কিন্তু পিতৃসূত্রে শরৎচন্দ্র কোনো কর্মের শিক্ষাও লাভ করেন নি। ফলে নিরন্তর কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ধরনের চেতনা সৃষ্টি হয়ে সমস্ত জগৎ-ব্যাপারটার সঙ্গেই একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে তা তাঁর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়ার কোনো প্রাথমিক সুযোগ ছিলো না। বস্তুতঃ তিনি জীবন ও মনের দিক থেকে যেন আল্‌গা থাকারই পরোক্ষ শিক্ষা পেয়েছেন।

স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা অকালে শেষ হওয়ার পর শরৎচন্দ্র যে জীবনটা বেছে নিলেন তাকে বলতে পারি আড্ডার জীবন। ভাগলপুরে আদমপুর ক্লাবে তিনি কিছুকাল আড্ডা দিয়ে বেড়ালেন, নাট্যাভিনয়ে মেতে রইলেন, খেলাধুলোয় গা ভাসিয়ে দিলেন। ঘরের কাজ নয়, বাইরের কাজে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার ঝোঁকও তাঁর মধ্যে দেখা দিলো। এই বহির্মুখিনতার স্বভাবটিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু সাহিত্যচর্চা অবশ্য চলেছিলো। পিতৃসূত্রে আর কিছু না হোক সাহিত্যানুরাগ তিনি পেয়েছিলেন। তারই দৌলতে এই সময়ে তাঁর কিছু কিছু লেখালেখির কাজও চললো—তিনি কিছু গল্প ও উপন্যাস লিখে ফেললেন। কিন্তু যে ছন্নছাড়া স্বভাবের বীজ তাঁর জীবনে আগেই বোনা হয়ে গিয়েছিলো, তার পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেলো না। বনেলী রাজ এস্টেটে কিছুদিন চাকুরি করলেন, আবার ছাড়লেন। তারপর হঠাৎ একদিন কোনো রহস্যময় কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে যান ও সন্ন্যাসীবেশে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ভাগলপুরে ফিরে এলেন বটে,

কিন্তু ভাইবোনদের একটা ব্যবস্থা করেই চলে যান কলকাতায়। কিন্তু সেখানেও মাস ছয়েকের বেশি থাকলেন না, একদিন বিশেষ কাউকে না বলে বর্মায় পাড়ি দেন। সেখানে রেঙ্গুন, পেগু প্রভৃতি স্থানে বছর তের কাটিয়ে বরাবরের জন্য দেশে ফিরে আসেন। এর পর অবশ্য তাঁর অজ্ঞাতবাসের পালা আর কখনও দেখা যায় নি, তিনি দেশ ও দশের মধ্যে সম্মানের সঙ্গে বাকি দিনগুলি কাটিয়েছেন।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, শরৎচন্দ্রের ছিলো একটা লাগাম-ছেঁড়া আল্‌গা মন এবং বাঁধনশূন্য বাউণ্ডুলে জীবন। তার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী তাঁর পিতৃদেবের অস্থির স্বভাব ও ছন্নছাড়া জীবনযাত্রা। শরৎচন্দ্র সে-কথা নিজেই স্বীকার করে গিয়েছেন—'From my father I inherited nothing except, I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early...'[১] দ্বিতীয়তঃ দায়ী বোধ হয় এক নারী—বালবিধবা নিরুপমা দেবী। শরৎচন্দ্র তাঁকে পছন্দ করতেন, কিন্তু নিরুপমা দেবী দুর্নামের ভয়ে তাঁকে বরাবর দূরে সরিয়ে রেখেছেন। সম্প্রতি রাধারাণী স্পষ্ট করে বলেছেন, শরৎচন্দ্রের দুইবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পেছনে ছিলো নিরুপমা দেবীর ভর্ৎসনা বা নির্দেশ। যদি একথা সত্য হয়, তবে বলবো শরৎচন্দ্র শুধু সমাজ ও পরিবার নয়, নারীর কাছ থেকেও কিছু পান নি। ফলে তিনি হয়েছেন ঘরছাড়া পথিক, বাঁধনহীন নিরাসক্ত মনের শরিক। তাই নিজের বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তিনি বরাবর উদাসীন থেকেছেন। লোকে যে তাঁর জীবনটাকে 'অদ্ভুত' মনে করে তা তিনি জানতেন, কিন্তু তার প্রতিবাদ কখনও করেন নি।[২]

দুই

শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের এই নিরাশ্রয়তার বীজ, এই অস্থিরতার স্বভাবসত্য, এই নিঃসঙ্গতার নিঃশব্দ অনুভব নিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। পারিপার্শ্বিকের গভীরে, জগৎ-ব্যাপারের অন্তস্তলে তাঁর অবতরণ ঘটলেও তার

১. শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের K. C. Sen ও Theodosia Thompson-কৃত ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

২. বাতায়ন, শরৎ স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪।

সঙ্গে সম্বন্ধটা কোথাও আল্‌গা থেকে গিয়েছিলো। এর ফলে, অনুমান করি, সত্তার গভীরে তিনি সময় সময় একটা একাকিত্ব অনুভব করতেন। নিজের এই উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষকে দেখতে গিয়ে তিনি অনেক সময় এমন কতকগুলি চরিত্র এঁকেছেন যা তাঁর নিজের চরিত্রের মতোই 'অদ্ভুত'। তারা সংসারের আর দশজন মানুষের মতো জগতের অন্তঃপাতী নয়, অন্তেবাসী মাত্র। সে-মানুষগুলি জীবন ও মনের দিক থেকে নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ। কোথায়ও বেশি, কোথাও বা কম। জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা সঙ্গতিহীন। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করছি।

শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাস 'বড়দিদি'র নায়কের নাম সুরেন্দ্রনাথ। তার বর্ণনায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না।··· সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না।··· নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোন কর্ম্মই যে তাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ হইতে পারে ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে, কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণভাবে আর একজনের উপর নির্ভর করিত।' অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ একটি আত্ম-নির্ভরতাহীন অস্বাভাবিক মানুষ। তার জীবনের মূল যেন জগৎ ও সমাজের গভীরে প্রবেশ করে নি। নিজের পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড় করাবার মতো শক্ত মাটি সে খুঁজে পায় নি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যার সম্বন্ধটা জৈবনিক নয়, নিতান্তই পরনির্ভর, সেখানে অন্তরের অন্তস্তলে সে যে একটি নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ মানুষ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এই নিরাশ্রয়তা ও শূন্যতাবোধ সুরেন্দ্রের মধ্যে ছিলো বলেই জীবন কখনও কখনও তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠতো। তখন তার, লেখক বলেছেন, 'কখনও কখনও মনে হইত, এ জীবন বাঁচিবার মত নহে।' স্পষ্টই বোঝা যায়, বিমাতার সস্নেহ সতর্কতার বোঝা জীবন সম্পর্কে তার বিতৃষ্ণার একমাত্র কারণ নয়, যেহেতু ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্যন্ত যে নিশ্চিত ঠাহর করতে পারে না, সে বিমাতার সস্নেহ সতর্কতার অত্যাচার বুঝবে কি করে! আসলে জগৎ, দেশ, সমাজ, পরিবার, মাতাপিতার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বোধ ও সম্বন্ধের শূন্যতা তার মধ্যে মাঝে মাঝে জানান দিতো। অস্তিত্বের নিরাশ্রয়তা ও একাকিত্বের বেদনা তার মধ্যে প্রবল ছিলো। এইভাবে শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যা out of tune with the rigid system of everyday world.

এই সুরেন্দ্রনাথ এক সময় তার অস্তিত্বের নিরাশ্রয়তা নিয়ে বড়দিদির কাছে এলো এবং মাধবীর সযত্ন ব্যবহারের মধ্যে নিজেরই অজ্ঞাতসারে এমন একটা অস্পষ্ট আলোর সূত্র দেখতে পেলো যা শুধু কোনো বিশেষ নারী নয়, সমস্ত সমাজ-সংসারের সঙ্গে তার সম্বন্ধটাকে নতুন করে গড়তে পারে। কিন্তু বিধবা বড়দিদির সমাজিক সত্তার সতর্কতা সেই সম্বন্ধটাকে বাড়তে না দিয়ে যেদিন তাকে দূরে সরিয়ে দিলো সেইদিন থেকে সে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্থূল অর্থে সংসারে প্রবেশ করলো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দেখা গেলো জমিদারি কিংবা স্ত্রী কারোর দিকে তার সত্যিকারের মন নেই, অস্তিত্বের দিক থেকে যথার্থ আশ্রয় সে খুঁজে পায় নি। উপন্যাসটির অন্তিম পর্যায়ে দেখি, মাধবীর কোলে মাথা রেখে সে বিশ্বের আরাম খুঁজে পেয়েছে এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখালেন, আসলে মানুষ বড়ো অসহায় ও নিঃসঙ্গ, আশ্রয়ের পরশ পাথর খুঁজে খুঁজে সে হয়রান হয়, তবু তার নিঃসঙ্গতা সব সময় ঘোচে না। সুরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মাধবীর কাছে জীবনের সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে বটে, কিন্তু ততদিনে বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে।

তিন

সুরেন্দ্রনাথের নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার কারণ তার শেকড়হীন জীবন, আত্ম-নির্ভরতাহীন চরিত্র। বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে হলে জীবন ও মনের যে স্বাবলম্বন প্রয়োজন, তা তার নেই। এর বিপরীত মানুষ হচ্ছে বিপ্রদাস। সে পূর্বাপর আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংবৃত ও স্বাবলম্বী। সংসারে শুধু নিজের দায় নয়, সকলের দায় অবলীলাক্রমে বহন করার মতো চারিত্রিক ও মানসিক বল তার আছে। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয় বিপ্রদাস যেন এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, বলরামপুরের মুখুজ্যে পরিবার তার কর্মিষ্ঠ জীবনের পত্রচ্ছায়ার তলায় নিরাপদে দিনযাপন করছে। সে সকলের আশ্রয় ও অবলম্বন। তার ব্যক্তিত্বের মূল এমন শক্ত ভিত্তিতে প্রবিষ্ট যে, কোনো ঝড়ঝাপটাই যেন তাকে উৎপাটিত করতে পারে না। শুধু পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেই নয়, সামাজিক বৃত্তের মধ্যেও তার বলিষ্ঠ বিচরণ। যে মুখুজ্যে পরিবারের 'কত দান, কত সৎ কাজ, কত আশ্রিত-পরিজন, কত দীন-দরিদ্রের অবলম্বন' তারই শক্তির উৎস বিপ্রদাস। তার দানের অঙ্কেরও দীর্ঘ তালিকা। আর সেই সব সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিপ্রদাস ওতপ্রোত-

ভাবে জড়িত। দেখে শুনে মনে হয়, তার জীবনটা একেবারে ভরাট; তার ঠাস-বুননের মধ্যে কোথায়ও ফাঁক নেই, আল্‌গা সুতো নেই, অপরিচ্ছন্ন জট নেই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই তথাকথিত ভরাট জীবনের মধ্যেও শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন এক অন্তর্লীন একাকিত্ব। সত্তার গভীরে, অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সে যখন আপনার ভেতরে আপনি এসে দাঁড়ায় তখন জেগে ওঠে একটা দুঃসহ নিঃসঙ্গতা। আশে পাশে যারা ছিলো তাদের মধ্যে অনেকেই তার মহত্ত্ব ও বিরাটত্বই দেখেছে, তার নিঃসঙ্গতা দেখে নি। তাকে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই সকলে অভ্যস্ত, তাকে তারই মধ্যে দেখবার প্রশ্ন কারও মনে জাগে নি। একটা বড়ো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখলে পত্রপল্লবের সমারোহই শুধু চোখে পড়ে না, তার ফাঁক-ফোকরও ধরা পড়ে। বোম্বাইবাসিনী বন্দনা মানুষটির কাছে দাঁড়িয়ে যখন দেখলো তার চোখে ধরা পড়লো বিপ্রদাসের সেই একাকিত্ব। কেমন করে বিপ্রদাসের এই নিঃসঙ্গতার রূপ বন্দনা ধরতে পেরেছিলো, তা তার নিজের মুখেই শোনা যাক্ —

'বিপ্রদাস কহিল, এই বিপুল সংসারে আমি যে এতখানি একা এ-কথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা? ···

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুঝেছিলুম।··· শেষ রাত্রে উঠে দেখি নীচে পূজোর ঘরে আলো জ্বলছে, আপনি বসেছেন ধ্যানে।···

বন্দনা কহিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম মনে হয় সকলের মধ্যে থেকেও আপনি আলাদা, আপনি একা।'

বিপ্রদাসের এই নিঃসঙ্গতা ধরা পড়েছিলো আর একজনের কাছে। সে দ্বিজদাস। অগ্রজের প্রতি ভালোবাসা ছিলো বলেই সে মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলো। বিপ্রদাসের গৃহত্যাগের পর দ্বিজদাস বন্দনাকে বলেছিলো— 'সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ছিল না। দুঃখ যখন এসেছে একাকী বহন করেছেন, আনন্দ যখন এসেছে তাকেও উপভোগ করেছেন একা।··· মানুষের সংসারে এত বড় নিঃসঙ্গ একলা মানুষ আর নেই।'

এদের দুজনের কাছে বিপ্রদাসের নিঃসঙ্গতার কারণও অস্পষ্ট থাকে নি। বন্দনা বলেছে, যেখানে উঠলে বিপ্রদাসের সঙ্গী হওয়া যায় সে-উচুতে আর কেউ উঠতে পারে নি বলেই তার এই নিঃসীম একাকিত্ব। বিপ্রদাস জিতেন্দ্রিয়, আজন্ম-শুদ্ধ সত্যবাদী সাধু। কঠোর তার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। এমন বড়ো, এমন সত্যবাদী, এমন নিষ্কলুষ যে চরিত্র

— যাকে দ্বিজদাস বলেছে সমুদ্র— তার কাছে হাত পাতবে কে? তার মনের কাছে পৌঁছোবে কে? প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে বিপ্রদাস কখনও কাউকে ভালোবাসে নি, অনেক উঁচু স্তরের মানুষ বলে কারও ভালোবাসা কখনও পায় নি। তাই বিপ্রদাসের ভালোবাসাহীন অস্তিত্ব নিঃসঙ্গতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় নি। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা ঊর্ধ্বমুখে জ্বলেছে বটে, জ্যোতির কণামাত্রেরও অপচয় ঘটে নি বটে, তবু নিরাশ্রয়তার পরিণাম তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বিপ্রদাসের মধ্যে, আমার ধারণা, শরৎচন্দ্র এমন একটা চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যে চরিত্র rigid system প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাঁর নির্জলা আদর্শবাদিতা হচ্ছে সেই rigid system-এরই প্রকাশ। একথাটাই স্পষ্ট করে বলেছে দ্বিজদাস—'আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সত্য-রক্ষার জন্য সর্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্য গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি-একটা বস্তু আছে যার জন্য পারে না এমন কাজ নেই,— ওরা এক ধরনের পাগল,— তাই এই দুর্দশা।' কিন্তু মানুষের জীবন system-এ বাঁধা যায় না। System একদিন জীবনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে। বিপ্রদাসের আদর্শবাদের অনড় শৃঙ্খলও বিদ্রোহ করেছে তার জীবনের বিরুদ্ধে। ফলে আমরা দেখলাম, বিপ্রদাস সংসারে কিছুই পেলো না— একটি নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় মানুষ হয়ে অজানার স্রোতে ভেসে গেলো। সেই একাকিত্ব-ভরা নিরালম্ব জীবনের বর্ণনা শরৎচন্দ্রের কলমে সত্যই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে—'তীর্থভ্রমণ দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে। সেদিন সংসারের আকর্ষণ হয়ত এই গৃহেই আবার তাঁহাকে টানিয়া আনিবে, কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে না বিপ্রদাসের, আর ফিরাইয়া আনিবে না তাঁহাকে এ-গৃহে।'

চার

জীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনমূলক উপন্যাস শ্রীকান্তের নাম-চরিত্রের মধ্যে। উপন্যাসটির বিভিন্ন পর্বে নানা মানুষের ভিড়, নানা রকম তাদের সমস্যা, নানা ধরনের তাদের চিন্তা। কেউ সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, কেউ অর্ধলগ্ন, কেউ বা যোগসূত্রহীন। এই সব বিচিত্র দৃশ্যের সাক্ষী শ্রীকান্ত। তাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সে কখনও কখনও আলোড়িত বটে, তবু সেই সব দৃশ্য তার চিত্তে যেন কোথায়ও স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে নি। তার মন যেন সমস্ত জগৎ-ব্যাপারের

চলৎস্রোতের ওপর দিয়ে তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে গেছে, থিতিয়ে বসে নি কোথায়ও। তার কারণ শ্রীকান্তের অন্তঃস্বভাবের বিশেষ ধাতু-প্রকৃতি। আর সেটি কৈশোরেই গঠিত হয়েছিলো ইন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে মানুষের মনকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করতে থাকে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র মোহ। অথচ সেই অল্প বয়সেই ইন্দ্রনাথ ঘরবাড়ি বিষয়-আশয় আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করে যায়, সে আর কখনও ফিরে আসে নি। তার মধ্যে একটা নিস্পৃহ বিবাগী মন ছিলো বলেই এমনভাবে অবলীলাক্রমে সংসার ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে গভীরভাবে ভালোবাসতো, তাই ইন্দ্রনাথের অকস্মাৎ অন্তর্ধান শ্রীকান্তের মনের শেকড় একেবারে ছিঁড়ে ফেলে, একটা ভবঘুরে স্বভাবের বীজ তার মধ্যে বুনে রেখে যায়। আর তারই ফল দেখতে পাই তার পরবর্তী জীবনের ইতিহাসের মধ্যে।

শ্রীকান্ত নিজের মনের এই চারিত্র্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। আত্মজীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে বারবার তার মুখে শুনতে পাই —

১. আমার এই **ভবঘুরে** জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে! — প্রথম পর্ব

২. এই **ছন্নছাড়া** জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। — দ্বিতীয় পর্ব

৩. এতকাল জীবনটা কাটিল **উপগ্রহের** মত।··· পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া, কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও **সেই বিদায় দেওয়া মনের সাড়া মিলে না।** — চতুর্থ পর্ব

লক্ষণীয় এই যে, শ্রীকান্ত নিজের সম্বন্ধে 'ভবঘুরে', 'ছন্নছাড়া', 'উপগ্রহ', 'বেয়াড়া', 'খাপছাড়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছে। সে সংসারের আর দশজনের মতো নয়, তাই তাকে নিয়ে 'ছি-ছি'-র অন্ত ছিলো না। বাহ্যতঃ তার কোনো আশ্রয় নেই, স্থিতি নেই, পথ চলার বিরাম নেই। ঠিক যেন যাযাবর মানুষ। সে ইচ্ছে করলে ঘর বাঁধতে পারতো, স্থিতিশীল হতে পারতো, ভোগে-কর্মে সুখী হতে পারতো। কিন্তু সেই ইচ্ছে তার হলো না তার কারণ তার নিজের মন বিধিলিপির মতো তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেই মন আপন নিস্পৃহতা

নিয়ে আপনি বিবাগী। শ্রীকান্তের মনের এই চেহারা রাজলক্ষ্মীর অজানা ছিলো না বলে সে দূরে চলে গিয়েও চিরদিনের জন্য হারাবার ভয়ে আবার কাছে সরে এসেছে বারে বারে। উদাসীন মানুষটির মনের যে কোনো শেকড় নেই একথা সে জানতো। আর প্রথম পরিচয়ের পরই বুদ্ধিমতী কমললতা শ্রীকান্তকে বলেছিলো—

—'তোমার মন হ'ল আসলে বৈরিগির মন, উদাসীনের মন— প্রজাপতির মতো। বাঁধন তুমি কখনো কোন কালে নেবে না··· ওগো নতুন গোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিসটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না। ···তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন— ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর কিছু আছে না কি!' — চতুর্থ পর্ব

শ্রীকান্তের ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া জীবনের অনিবার্য ফল তার নিরাশ্রয়তা। সংসারে স্থির হয়ে দাঁড়াবার মতো ঠাঁই তার মেলে নি, উপগ্রহের মতো শুধুই ঘুরে মরেছে সে। তার নিজের জায়গা বলতে, আশ্রয় বলতে কিছু জোটে নি তার জীবনে। আর সে-জন্যই শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছে—'ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত— শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলাটা যেন আর না ফুরায়।' আর শ্রীকান্তের উদাসীন বিবাগী মনের পরিণাম হচ্ছে তার একাকিত্ব। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, কত মানুষের সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রাণ-মনের যোগ, সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান, দেওয়া-নেওয়ার পালা নিত্য চলেছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তথাকথিত সমস্ত যোগ-বিয়োগ সত্ত্বেও তার মনের নিঃসঙ্গতা কখনও ঘোচে নি। সেই নিঃসঙ্গতার বেদনা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো বলেই শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে বিশ্বসংসারকে প্রশ্ন করেছে—'আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না?' শ্রীকান্ত নিজের বলে কিছুই না পাওয়ায় তার মনের নিঃসঙ্গতারও কোনোদিন অবসান হয় নি। পাবেই বা কি করে— তার বিদায়-দেওয়া মনের যে কোনো সাড়া নেই! সেখানে একটা মস্তবড়ো শূন্যতা। কমললতা যখন বলেছিলো—'চল না গোঁসাই, সব ফেলে দুজনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি'— তখন এই উদাসীন মনের জন্যই শ্রীকান্ত ধরা দেয় নি; বলেছিলো—'সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি।' এই উক্তি সেই অহঙ্কারী নিরাসক্ত মনের কথা, যা বিশ্ব থেকে বিচ্যুত— আপনাতে আপনি আবদ্ধ। শ্রীকান্তের মনের এই চেহারা দেখেই বজ্রানন্দ বলেছিলো—'আপনাদের মত নিঃসঙ্গ একাকী লোকদের আমি ভয় করি।'

সুতরাং আমরা দেখলাম, নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার চেতনা শ্রীকান্তের নিত্য

সঙ্গী। মনে হয়, স্রষ্টার আত্মপ্রক্ষেপের ফলেই চরিত্রটির মধ্যে এমন নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ রূপ দেখা দিয়েছে। রাধারাণী দেবীর একটি সাম্প্রতিক উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'শ্রীকান্ত শেষ পর্বটি আমাদের সামনে লেখা। তখন তাঁর মনের অবস্থা খুব নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে ভরা। সংসারের কোনো কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, মানুষ একমাত্র নিজের মনের মধ্যেই আশ্রয় নিতে পারে, বাইরে কোথাও নয়, এই কথাই বেশি সময় বলতেন।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকান্ত জীবনের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু ক্যামুর Outsider-এর মতো তার জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা নেই— জীবনের মূল্যবোধ তার নষ্ট হয়ে যায় নি। বরং তুচ্ছ নিয়মগুলিকে বড়ো করে না দেখে মানুষের জীবনকে তার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা করা যায় বলেই তার বিশ্বাস। এটাও শ্রীকান্তের জীবনদর্শনের অস্তিবাদী দিক।

পাঁচ

সাধারণভাবে পুরুষের চেয়ে নারীর সংসারের প্রতি আসক্তি বেশি। পুরুষের জীবনে কর্মকাণ্ডের জটিলতা ও অধিকারবোধের ব্যাপকতা যত, নারীর জীবনে তত নয়। নারীর প্রবণতা সংকোচনের দিকে, পুরুষের প্রবণতা প্রসারের দিকে। নারী অল্পেই সন্তুষ্ট, পুরুষ অল্পে সন্তুষ্ট নয়। তাই জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে পুরুষের চেয়ে নারীর নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া দার্শনিক অর্থে সত্তাসংকট বা অস্তিত্বের সমস্যা বলতে যা বুঝি, তা পুরুষের ক্ষেত্রে যতটা লক্ষণীয়, নারীর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ততটা নয়।

শরৎ-সাহিত্যে পুরুষের নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি এবং তার কারণ যে সর্বত্র এক নয়, এটাও লক্ষ্য করেছি। এই নিরাশ্রয়তার বীজ ও প্রকাশ শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রেও আছে। যে কারণে শরৎ-সাহিত্যে নারীর প্রাধান্য, কতকটা সেই কারণে চরিত্রেরও নিরাশ্রয়তা। সেটা হচ্ছে দেশের বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর প্রেমের সমস্যা। সেই সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি নিরালম্ব নিরাশ্রয়ের মতো সমাজ-সংসারের বাইরে চলে গেছে, ভেসে গেছে অকূলের স্রোতে। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

বড়দিদি মাধবীর কোলে মাথা রেখে সুরেন্দ্রের মৃত্যুর পর লেখক মাধবীর

কাহিনী আর বলেন নি। কিন্তু এই চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটার আগেই সে হয়েছে পিতৃগৃহ ছাড়া, সে আশ্রয় নিয়েছে স্বামীগৃহে। কিন্তু সেখান থেকেও এক সময় তার উচ্ছেদ হলো। এর পর, আমরা অনুমান করতে পারি, বুকজোড়া শূন্যতা নিয়ে সে ঘুরে বেড়াবে কাশী-বৃন্দাবনের পথে পথে। হাতের কাছে কোনো ঠাকুর-দেবতা হয়তো মিলবে, কিন্তু তাতে কি ভরে উঠবে তার শূন্য হৃদয়? কিন্তু সেই বৃত্তান্ত লেখকের মুখে আমরা শুনতে পাই নি। তিনি শুধু নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার সম্ভাব্য অন্ধকারের মধ্যে চরিত্রটিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

পল্লীসমাজের রমাকেও এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। সে কৈশোর সমাগমেই ভালোবেসেছিলো রমেশকে, কিন্তু উভয়ে ব্রাহ্মণসন্তান হলেও কৌলীন্যের তারতম্যের জন্য তাদের মিলন হতে পারে নি। কিন্তু পরে বিধবা রমার মধ্যেও ভালোবাসা বেঁচে ছিলো। সেই ভালোবাসাই হলো কাল, ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করেও সে শেষরক্ষা করতে পারলো না। তাকে শেষ পর্যন্ত সমাজ ছাড়তে হলো, হতে হলো কাশীবাসী। কাশী-বৃন্দাবন তো এক ধরনের নৈরাজ্য, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল। রমা বিশ্বেশ্বরীর অভিভাবকত্ব সত্ত্বেও সেই নৈরাজ্যের শূন্যতার মধ্যে অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাতে বাধ্য হলো। মানুষের বাস্তব অস্তিত্বের পক্ষে এই নিঃসঙ্গতা একটা মর্মান্তিক অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়।

কিংবা ধরা যাক্ শ্রীকান্তের কমললতার কথা। এই বিধবা মেয়েটির অপরাধ, সে একুশ বছর বয়সে শরীরের জ্বালায় অবৈধ সন্তানের মা হয়েছিলো। কিন্তু তার জন্য তাকে ছাড়তে হলো ঘর। সে অনেকদিন ঘুরে বেড়ালো কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায়। শেষে তার আশ্রয় জুটলো মুরারিপুরের আখড়ায়। কিন্তু মরণাপন্ন গহরকে সেবা করার তথাকথিত কলঙ্কের জন্য সে আশ্রয়ও তার একদিন ঘুচে গেলো! তার সামনে রইলো বৃন্দাবনের পথ। একটি শরীর ও মন থাকার অপরাধে কমললতা ঘর-সংসার হারিয়ে কেমনভাবে নিরাশ্রয় হয়ে গেলো, তারই মর্মস্পর্শী চিত্র শরৎচন্দ্র অঙ্কন করেছেন। কমললতার মুখেই আমরা শুনতে পাই—'ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।'

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী কিরণময়ীর আগুন নিয়ে খেলার আরম্ভ তার দাম্পত্য-জীবনে। এ-খেলার প্রথম অধ্যায় অনঙ্গ ডাক্তারকে নিয়ে, স্বামী হারাণচন্দ্রের অসুখের সময়ে। ছলনাময়ী তখন পেতেছিলো রূপের ফাঁদ, জুগিয়ে চলেছিলো অনঙ্গ ডাক্তারের কামনার ইন্ধন। কিন্তু উপেন্দ্রের সঙ্গে যেদিন পরিচয় হলো, সেদিন তার হৃদয় জলভারাক্রান্ত মেঘের মতো বর্ষণোন্মুখ হয়ে উঠলো। কারণ স্বামীকে সে কখনও

ভালোবাসে নি, স্বামীর ভালোবাসা সে কখনও পায় নি। কিন্তু হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর পর সে সরাসরি ভালোবাসা জানালো উপেন্দ্রকে, কিন্তু প্রতিদানে পেলো ঘৃণা। এর ফলে দিবাকরকে নিয়ে শুরু হলো কিরণময়ীর জুয়োখেলা। উপন্যাসের শেষে দেখি, জীবনের জুয়োখেলায় কিরণময়ী হেরে গেছে। কোনো রকমে দিবাকরের হাত থেকে শরীরটাকে বাঁচিয়েছে বটে— কিন্তু গেছে তার রূপ, যৌবন, মন, এমন কি স্মৃতি পর্যন্ত। এখন সে দেহমনে দেউলিয়া, নিঃস্ব। তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা তাকে নিরাশ্রয়তার এমন স্তরে পৌঁছে দিয়েছে যেখান থেকে উদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কিরণময়ীর নারীসত্তার এই নিরাশ্রয়তার মূলে তার একটি অপরাধ— সে ঠাকুর-দেবতা মানতো না, ইহকাল-পরকাল মানতো না, মানতো শুধু শরীর-মনের আস্তিক্য।

এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি গৃহদাহের অচলাকে। স্বামী মহিমের শান্ত প্রেম তাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। সে স্বামীর বন্ধু সুরেশের উদ্দাম ব্যক্তিত্ব ও উগ্র বাসনার কাছে নতি স্বীকার করেছে। সে যে আত্মরক্ষা করতে পারে নি তার জন্য সেই দুর্যোগের রাত্রিই শুধু দায়ী নয়, তার নিজের কিছু আচরণ ও আবেগমথিত উক্তিও দায়ী। গৃহদাহের ঘটনায় তার আনুষ্ঠানিক আরম্ভ, মোগলসরাই স্টেশনে অচলাকে ভুলিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তার ক্রমবিকাশ, এক সর্বনাশা রাত্রিতে সুরেশের সঙ্গে মিলনে তার নিদারুণ পরিণতি। কিন্তু অচলার নিরুত্তাপ দেহ পাওয়ার পর সুরেশ যখন বুঝতে পারলো অচলা এখনও মহিমেরই অনুরাগিণী তখন সে মাঝুলির প্রেগ-মহামারীতে আত্মাহুতি দিয়ে স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলো। অচলার পতনের জন্য মহিমের পরোক্ষ দায়িত্ব ছিলো বটে, তবু সে সসম্মানে সমাজে রয়ে গেলো। শুধু চিরদিনের জন্য নিরাশ্রয় হলো অচলা, জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো তার ভবিষ্যৎ। এখানে উপন্যাসের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

'মহিম এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও?

অচলা কহিল, কাল থেকেই আমি তাই কেবল ভাবছি। শুনেছি বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীর জন্য আশ্রম আছে, সেখানে কি হয়, আমি জানিনে, কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু—' বলিতে বলিতেই তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে টল্‌টল্ করিতে লাগিল। এই প্রথম তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

মহিমের বুকে করুণার তীর বিঁধিল, সে কেবল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, আমিও জানিনে, তবে খোঁজ নিতে পারি।'

এখানে বামুনের মেয়ের সন্ধ্যাকেও স্মরণ করা যেতে পারে। নিজের কোনো অপরাধের জন্য নয়, শুধুই বংশগ্লানির জন্য সন্ধ্যা দেশ-ছাড়া হয়েছে। যখন তার পিতা প্রিয় মুখুজ্যের জন্মরহস্য প্রকাশ হয়ে পড়লো, তখন সন্ধ্যাকে ভালোবেসেও অরুণ তাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। অতএব বংশের কলঙ্ক নীরবে মাথা পেতে নিয়ে সন্ধ্যা পিতার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পথে নেমে এলো। রাত্রির অন্ধকার স্টেশনের কাছে হতভাগ্য পিতাপুত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালো অবৈধ মাতৃত্বের শাপ নিয়ে আরেক হতভাগিনী— বিধবা জ্ঞানদা। অতঃপর তাদের তিনজনের জীবনে বৃন্দাবনের পথ ছাড়া আর কিছু খোলা রইলো না।

ছয়

সুতরাং একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শরৎ-সাহিত্যের অনেক চরিত্রের ভাগ্যে দেখা দিয়েছে একটা নিরাশ্রয়তার অভিশাপ। কোথায়ও কোথায়ও সেই নিরাশ্রয়তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা নিঃসঙ্গতার চেতনা। তাদের চোখে জল, বুকে হাহাকার, দৃষ্টিতে অন্ধকার। চরিত্রগুলির এই বিধিলিপি কোনোক্রমেই স্রষ্টার অজ্ঞাতসারে নির্দিষ্ট হয় নি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাশ্রয়তার যে অভিজ্ঞতা এবং সাধারণভাবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে স্বোপার্জিত উপলব্ধি, তারই মধ্যে চরিত্রগুলির নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার জন্ম। প্রশ্ন উঠতে পারে, সেই স্বগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অতিরিক্ত কোনো জীবনদর্শন ও নৈতিক বুদ্ধি তার পেছনে কাজ করেছে কি? কোনো বুদ্ধি-আশ্রিত তাত্ত্বিক দৃষ্টির প্রণোদনা নিয়ে কি চরিত্রগুলির মর্মচিত্র রচনায় তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন?

আমরা জানি, বিদ্যাজীবী ও বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায়, শরৎচন্দ্র ঠিক তা ছিলেন না। সত্য বটে, এক সময় তিনি খুব পড়াশুনো করতেন এবং দশ বছর ধরে Physiology, Biology, Psychology ও History[৪] পড়েছিলেন, তবু তিনি কখনও নিজেকে বিদ্বান ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন নি। এদিক থেকে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বঙ্কিম ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষায় সমৃদ্ধ। তাঁর মনন-সাধনার দীর্ঘ ইতিহাসে দার্শনিক জিজ্ঞাসার অভাব নেই। তাই তিনি একদা

৪. শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (১৩৫৪) গ্রন্থে ২২.৩.১২ তারিখে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্র দ্রষ্টব্য।

বলেছিলেন—'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—"এ জীবন লইয়া কি করিব?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।' কিন্তু শরৎচন্দ্রের মধ্যে এ-ধরনের কোনো জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায় নি। লেখক হিসেবে তাঁর অভ্যুদয়ের যেটা কাল মোটামুটি সেই কালই Existentialism বা অস্তিবাদী দর্শনের উদ্ভবের কাল।

অস্তিবাদী দার্শনিকেরা প্রশ্ন তুলেছেন—'How am I related to the world?' নিজের ব্যক্তিসত্তাকে খোঁজার চেষ্টা, সামাজিক রীতিনীতির নিগড়ে না বেঁধে জীবনকে তার মহিমায় প্রকাশ করার চেষ্টা, প্রেমের বাস্তব রূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এই সবই বর্তমান কালে মানুষের নিজেকে অনুসন্ধানের চেষ্টা। আধুনিক বিশ্বে যেখানেই নিয়ম— তা সামাজিক হোক, বৈজ্ঞানিক হোক, ধর্মীয় হোক— মানুষের জীবনকে নিপীড়ন করেছে, তার ব্যক্তিসত্তাকে বিপর্যস্ত করেছে সেখানেই মানুষের এই প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই আত্মপ্রকাশ সাহিত্যে ঘটেছে, দর্শনেও ঘটেছে। দার্শনিকেরা এই আত্মানুসন্ধানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রথিত করে এক নতুন জীবনদর্শন খাড়া করেছেন। আর তাই বর্তমান যুগের একটি প্রধান দর্শন Existentialism। এই দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ আসলে নিজের কাছে ও পৃথিবীতে পরবাসী বা stranger ছাড়া কিছু নয়, কারণ জগতের সব কিছুই হচ্ছে খাপছাড়া বা absurd। ফলে জীবনের পরিণাম নিঃসঙ্গতার দুঃখভোগে। অস্তিবাদীদের এই নৈরাশ্যবাদ, নিরাশ্রয়তাবাদ ও নিঃসঙ্গতাবাদের কিছু প্রতিধ্বনি ইতিহাসেও পাওয়া যায়। টয়েনবির মতো ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর সমৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষ ক্রমশঃ স্বাধীনতা হারিয়ে নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে।

এই অস্তিবাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ছিলো কি না সেটা বড়ো কথা নয়, খুব সম্ভবতঃ ছিলো না। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষকে তার সমাজ-জীবন যে আঘাত হানছে, তা শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের নিরাশ্রয়তা ও একাকিত্বের সমর্থন, আগেও বলেছি, তিনি আপন জীবন থেকেও পেয়েছিলেন। কারণ তিনি নিজেও ছিলেন নিপীড়িত ও নিয়ম-না-মানা মানুষ। ব্যক্তি-জীবনের এই আত্মানুসন্ধানের ইতিহাসকেই তিনি বিভিন্ন নরনারীর জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আর মানুষের এই আশ্রয় খোঁজার প্রচেষ্টাই শরৎ-সাহিত্যে আধুনিক জীবন-চেতনা।

যৌনতাবোধ

এক

যৌনতা প্রকৃতির ধর্ম। সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসে এ এক অমোঘ সত্য। যে দুর্বার প্রবৃত্তি শরীরকে আশ্রয় করে, সব কিছুর জন্ম দেয়, মৃত্যুর পরেও সন্তানের মধ্যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সৃষ্টি যতদিন থাকবে ততদিন থাকবে যৌনতা। কিন্তু সৃষ্টির মূলীভূত এই আদিম শক্তিকে মানুষ অনেকদিন থেকে তার ক্রমার্জিত Sophistication দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে এসেছে, বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছে সামাজিক taboo-র দড়িদড়া দিয়ে।[১] সামাজিক নীতির ভারসাম্য রক্ষার দায়টা তার কাছে বেশি জরুরি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিকে সেইসব sophistication আচ্ছাদন ও নৈতিকতার কৃত্রিমতা থেকে পুনরাবিষ্কার করার কৃতিত্ব বিশ শতকের। কয়েক শতাব্দীর সাহিত্যে যা নিষিদ্ধ হয়ে ছিলো, সেই সম্ভোগের বিষয়টাকে সাহিত্যের প্রকাশ্য অঙ্গনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বর্তমান শতাব্দী। লেখকরা আপন আপন রুচি অনুযায়ী বিষয়টাকে নিয়ে নাড়াচড়া করছেন, ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আমাদের সাহিত্যে এ-কাজ শুরু হয়েছে শরৎচন্দ্রের আগে থেকে। শুধু তাই নয়, বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে যৌন-বাস্তবতার পোষ্টা বলে অনেকে মনে করতেন। যেহেতু যৌন-চেতনা একটা আধুনিক চেতনা হিসেবে বিবেচিত, সেই হেতু যৌনতার আলোকে শরৎ-সাহিত্যকে বিচার করা বর্তমানে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক।

বাংলা সাহিত্যের যে অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ও অবস্থিতি, তার পরিবেশ যৌনতার প্রবেশের পক্ষে প্রতিকূল ছিলো না। বঙ্কিমের রোহিণীর ইতিহাস বিধবা যুবতীর সম্ভোগবাসনা ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইতিহাস। বিষবৃক্ষের বীজ উত্তপ্ত হয়েছে কুন্দনন্দিনীর দেহলাবণ্যের প্রতি বিবাহিত নগেন্দ্রের আসক্তির মধ্যে এবং তার পরিবর্ধন ঘটেছে কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের লালসার রসসিঞ্চনে। হীরার নাগিনী-তৃষ্ণা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবাহিতা শৈবলিনীর জীবনচক্র আবর্তিত হয়েছে বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপকে কেন্দ্র করে এবং তাতে গতি সঞ্চার

১. প্রবন্ধ, অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃঃ ৬৯৯-৭০০।

করেছে এক দুর্মর প্রবৃত্তির বাত্যাবিক্ষোভ। এইভাবে অবৈধ ও অনৈতিক প্রেমাসক্তির যে সব চিত্র বঙ্কিম রেখে গিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যৌনতার প্রবেশপথ একটু একটু করে রচিত হচ্ছিল।

তারপর রবীন্দ্রনাথ এসে সেই পথটিকে প্রশস্ততর করে তুললেন। চোখের বালির মূল বিষয় বিধবা বিনোদিনীর প্রেম। মহেন্দ্রকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করার জন্য বিনোদিনীর বিচিত্র ছলাকলা ও নিপুণ অভিনয় এবং বিনোদিনীর আকর্ষণে মহেন্দ্রের মানসিক ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ ও মোহমদির উন্মত্ততা প্রবৃত্তির লীলাবিলাসের এক চমকপ্রদ কাহিনী। সেই কাহিনী, সেই মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয়লীলার ইতিবৃত্ত, পাঠকের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এমন দুটি নরনারীকে যাদের শারীরিক আড়াল যে-কোনো মুহূর্তেই সরে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এখানে যেন যৌনতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। রূপ দিয়ে পুরুষকে জয় করার যে বাসনা নারীর থাকে, সেই বাসনার তাড়নায় এবং নিজের অতৃপ্ত দেহমনের তৃষ্ণার দাপটে বিমলা অন্ততঃ একদিন সন্দীপের বড়ো কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো—সেদিন যদি সন্দীপেরই মনে 'কিন্তু' না জাগতো তবে বিমলার শারীরিক আত্মসমর্পণ বোধ হয় রোধ করা যেত না। চতুরঙ্গে দেখা যায়, এক রাত্রিতে গুহার অন্ধকারে শচীশের সামনে দেখা দিয়েছে আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নেই, কান নেই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে। সেই জান্তব কালো ক্ষুধা আর কারও নয়, দামিনীর। এখানেও নরনারীর নৈতিক প্রাকার যৌনতার আক্রমণে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। এমনিতর অসামাজিক আসক্তির আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নষ্টনীড় (১৩০৮) ও স্ত্রীর পত্রে। এর দ্বারা তিনি জীবনের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে ধ্বংসাত্মক খননকার্য চালিয়েছেন এবং যৌনপ্রবৃত্তির স্ফূর্তির ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চেয়েও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তমস্বিনী (খ্রী. ১৯০০) উপন্যাসে এক অসামাজিক প্রণয়-কাহিনী ও যৌন-বাস্তবতার চিত্র রচনা করে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কল্লোলের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) পুঁটেরাম গল্পে নায়কের সঙ্গে বিবাহিতা চাঁপার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কাহিনীতে সেই শারীরিক তৃষ্ণারই জের টানা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর অনূদিত মেরিমোর ফুলদানী গল্পে পাওয়া গেছে যৌন-স্বাধীনতার বিদেশী ছবি। শরৎচন্দ্রের সমকালীন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঠানদিদি, শুভা, শান্তি, দত্তগিন্নী, দ্বিতীয় পক্ষ ইত্যাদিতে দেখিয়েছেন যৌন-জীবন ও অধঃপতিত নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে

বিপ্লবাত্মক মনোভাব। বিবাহিতা নারীর স্বামীগৃহ ত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ, প্রৌঢ়া নারীর পরপুরুষে গোপন আসক্তি, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারের চিত্র রচনায় তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বশবর্তী হয়েছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী উপন্যাসের অনুসরণে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস লেখেন — যেমন চোরকাঁটা, যমুনা পুলিনের ভিখারিনী, দোটানা, স্রোতের ফুল, পঙ্কতিলক ইত্যাদি— তাতে যৌন-বিষয়ে নরেশচন্দ্রের মতোই দুঃসাহসিকতার পরিচয় আছে। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের ডালিম জাতীয় গল্পকে অভিহিত করেছিলেন 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' নামে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্বে প্রকাশিত কল্লোল ও কালি-কলম পত্রিকায় যৌন-বিদ্রোহের প্রায় এক সর্বাত্মক রূপ দেখা গিয়েছিলো। যৌনতা শুধু এ দুটি কাগজের তরুণ লেখকদের বুদ্ধির মহলে সীমাবদ্ধ ছিলো না, তা তাঁদের বয়সোচিত শরীর-ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় জীবন-সম্পর্কে সামগ্রিক প্রশ্নেরই আকার নিয়েছিলো। তাঁদের সাহস জুগিয়েছিলো প্রায়-সমকালের কিছু বাঙালি লেখকের যৌন-বাস্তবতা ও বিদেশী লেখকদের যৌন-স্বাধীনতা। কল্লোলগোষ্ঠী তাঁদের সৃষ্টির আসরে শরীরজ সম্ভোগস্পৃহাকে অনেকটা প্রকাশ্য করতে চেয়েছিলেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে স্বাভাবিক, এটা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, তাতে পাপ যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে আদি পাপ এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া শারীরিক জীব মানুষের পক্ষে সম্ভব বা উচিত নয়। তাই কল্লোলীয়দের লেখায় শারীরিক তৃষ্ণার জয়জয়কার ও কামাতুরতার বর্ণনার প্রাচুর্য। তাঁরা তাঁদের গল্প ও কবিতায় প্রেমকে আশরীর ছড়িয়ে দিয়েছেন। কল্লোল, কালি-কলমের লেখকদের লেখায় এই যে রিরংসাপ্রবণতা ও যৌন-বিদ্রোহের প্রকাশ, তা সেকালে কোনো কোনো মহলে ধিকৃত হয় এবং লেখকদের বিরুদ্ধে মানসিক অস্বাস্থ্য ও অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এর ফলে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের যে বিবাদ শুরু হয়, তা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে দুটি বৈঠক বসে। শরৎচন্দ্র কল্লোল, কালি-কলম পড়তেন; কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো। তাই তরুণ লেখকদের যৌন-বিদ্রোহের কথা তিনি জানতেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিচিত্রা ভবনের সভায় নবীনপন্থীদের দলে উপস্থিতও ছিলেন।

দুই

শরৎচন্দ্র যে-কালের সাহিত্যিক ছিলেন সেই কালে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশে ফ্রয়েড-চর্চার সূত্রপাত ও প্রসার ঘটে। ভারতীগোষ্ঠীর কোনো কোনো লেখক এবং কল্লোলগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ লেখক ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সেই মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাতের ফলে স্বপ্নের আকাশ নতুন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে; নারী-পুরুষ, জননী-সন্তান, দেহ-মন, প্রেম-কাম ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো ধারণাগুলি অনেকটা পাল্‌টে যায়। ফলে সেকালের ফ্রয়েড-চর্চা তরুণ সমাজে, তাদের চৈতন্যের রাজ্যে আনে এক আলোড়ন। বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয় নয়' (কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৬) গল্পের এক জায়গায় আছে—'ফ্রয়েড্‌ পড়ে অবধি আমার মনে হয়েছিলো যে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিষ নেই—থাকতে পারে না—যা আমি না বুঝতে পারি।' আসলে এ শুধু গল্পের কথকের মনের কথা নয়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের বাংলার নবোদ্ভূত যুবক সমাজেরই মনের কথা। সাইকো-অ্যানালিসিসের সূক্ষ্মতম অণুবীক্ষণ হাতে নিয়ে তারা জীবনরহস্যের সিংহদ্বারে প্রবেশ করে তার সবটুকু ধরতে চাইছিলো। এখানে আমাদের মনে পড়ে ১৯২৩ খ্রী. রচিত গোকুলচন্দ্র নাগের পথিক উপন্যাসের নায়িকা মায়ার একটি চাঞ্চল্যকর উক্তি—'শ্রীশদার কাছে আমি কতটা সহজ হতে পেরেছি তা বুঝতে পারবেন যদি বলি ওর সঙ্গে আমি Havelock Ellis-এর Sex psychology-টা সমস্ত পড়েছি… !' এখনকার লেখক-সমাজে এই ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ্য করেই ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কল্লোলে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন— ফ্রয়েড, ইয়ুং এবং পরদেশী সাহিত্যের জ্বালায় আমরা sex-conscious হয়ে পড়েছি।

শরৎচন্দ্র এই তরুণ লেখকগোষ্ঠীর অনেক বড়ো ছিলেন এবং তরুণদের মতো বিদেশী নব্যবিজ্ঞান ও নব্যসাহিত্যের নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। তিনি যে ফ্রয়েড, ইয়ুং, হ্যাভলক এলিস ইত্যাদির গ্রন্থ পড়েছিলেনই এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে এক সময় তিনি যে ফিজিওলজি, বায়োলজি ও সাইকোলজি অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়েছিলেন, তার মধ্যে মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান থাকা খুবই সম্ভব। যদি তিনি এই সব বিষয়ের ওপর লেখা গ্রন্থাদি পাঠ না-ও করে থাকেন, তবু দেশী-বিদেশী যে-কোনো সূত্রেই হোক ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার সঙ্গে অন্ততঃ সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। এ ছাড়া তিনি বর্মা প্রবাসকালে হার্বার্ট স্পেনসার ভালো করে পড়েছিলেন। তার প্রমাণ আছে

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে। স্পেনসার ছিলেন ডারুইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। শরৎচন্দ্র স্পেনসারের সূত্রে ডারুইনীয় তত্ত্বের সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি পরিচিত ছিলেন ডারুইনের গ্রন্থাদির সঙ্গে। 'নারীর মূল্য'-এ ডারুইনের Descent of Man (১৮৭১ খ্রী.)-এর উল্লেখ আছে। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, শরৎচন্দ্র যৌনবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

তিন

সবশেষে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর এক সময়ের দিনযাত্রার ছকটা আর দশজন বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মতো ছিলো না। তাঁর তখনকার লাগামহীন জীবনে ছিলো না শাসনের অঙ্কুশ-তাড়না, আত্মসংযমের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার কোনো শর্ত এমন কি নিজের কাছেও তিনি অঙ্গীকার করেন নি। তিনি অনেকটা যেমন-খুশি-তেমন জীবন যাপন করেছেন। ভাগলপুরে থাকতে নেশা-ভাং করেছেন, তার বেশি কিছু বোধ হয় নয়। কিন্তু রেঙ্গুনে তাঁর বারো-তের বছরের প্রায় অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস আজও কতকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। মিস্ত্রি-পাড়ায় নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যখন তিনি বাস করতেন, তখন তাঁর চলার পথ বোধ করি তেমন মসৃণ ছিলো না। রাধারাণী দেবী বলেছেন, তিনি অনেক সময় অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খলতার রোমহর্ষক কাহিনী মুখে মুখে বলে যেতেন এবং সেগুলিকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে চালিয়ে দিতেন। তার অধিকাংশই ছিলো উপস্থিত-মতো বানানো গল্প। মুখে-বলা এই সব কথার মধ্যে সাজানো ঢং যতই থাক তার ভিত্তিমূলে নিশ্চয়ই কোথায়ও সত্যের সংসার বিরাজমান ছিলো। তাঁর উপন্যাসেও আছে অজস্র পাপ ও পাপীর চিত্র। সেগুলির বিন্যাসের মধ্যে লেখকের লিপিকুশলতা ও সৃজনীশক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, তারা লেখকের অভিজ্ঞতার সরণি বেয়েই সাহিত্যের আসরে এসেছে। পাপ ও পাপী, যৌন-অনাচার এবং নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি রেঙ্গুন প্রবাস-কালে প্রশস্ততর হয়েছিলো বলে অনুমান করি। এতে শরৎচন্দ্রকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। যিনি কাগজের বই নয়— জীবনের

বই পড়ে জীবনকে জেনেছিলেন, তিনি স্রষ্টা হিসেবে চিরকাল আমাদের নমস্য হয়ে থাকবেন।

যৌনতার জগৎ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তাঁর চিঠিপত্রেও পাওয়া যায়। হরিদাস শাস্ত্রীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'নারী জাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সেসব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর কেউ বা বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থাতেও তাদের দেহের উপর আমার কখনও লালসা হয় নি। তার কারণ এই নয় যে আমি অত্যন্ত সাধু, সংযত, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে তাকে উপভোগ করার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠে নি কখনও।'[২] এখানে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত ব্যভিচারের কথা অস্বীকার করেছেন, কারণটা অবশ্য নীতিগত নয়, রুচিগত। কিন্তু যিনি অস্থানে কুস্থানে গিয়েছেন, বারবনিতাদের অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করেছেন, তিনি নিজে যৌন-অনাচারে লিপ্ত না হলেও আরও অনেকের যৌন অনাচার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। অধিকাংশ মানুষের যৌন-অভিজ্ঞতা দাম্পত্য-সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, এমন কি অনেক লেখকের অভিজ্ঞতাও প্রায়শঃই তার বেশি এগোয় না—কিন্তু শরৎচন্দ্র দাম্পত্য-সীমার বাইরে বারবনিতার গৃহে যৌন-জীবনের বিলোল, বিচিত্র ও বিকৃত রূপ দেখেছিলেন, বর্তমান আলোচনায় সেকথাটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

চার

সুতরাং একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক ও জৈবনিক পটভূমি এমন ছিলো না, যা তাঁর উপন্যাসে যৌনতার উপস্থাপনায় বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই বোধ হয় আপন কালের জীবনভাষ্য রচনা করতে গিয়ে তিনি নরনারীর যৌনপ্রবণতার দাপটের কথা মাঝে মাঝে উপস্থাপিত করেছেন।

নরনারীর জীবনের বর্ণনায় নারীর রূপের বর্ণনা সব দেশের সাহিত্যেই দেখা যায়। প্রাক্-আধুনিক যুগে নারী-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় নারীর মূল্য

২. শরৎ-পরিচয় (২য় সং), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮০।

তখন নির্ধারিত হতো দেহ ও রূপের তুলাদণ্ডে। তাই সাহিত্যেও নরনারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রাথমিক উৎস হতো শরীর। প্রেমের প্রতিষ্ঠা হতো সেই শারীরিক অস্তিত্বের ওপর। সেইজন্য প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা অনিবার্যভাবেই রূপের বর্ণনা ফেঁদে বসতেন। আর সাম্প্রতিক কালের তপ্ত উপন্যাসে যৌনতার জয়ডঙ্কা বাজানো হয় এই শরীরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু উনিশ শতকে নারী-ব্যক্তিত্বের উন্মেষের কাল থেকে, যখন নারীর মনের ঐশ্বর্য ও মানবিক মহত্ত্ব পুনরাবিষ্কৃত হতে শুরু করে, তখন থেকে সাহিত্যে নারী-রূপের বর্ণনার গুরুত্ব কমতে থাকে। আমাদের প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সময়ে নারীমুক্তির আয়োজন আরম্ভ হলেও তেমন অগ্রসর হয় নি। তাই তিনি তাঁর উপন্যাসে অনিবার্যভাবেই টেনে এনেছেন রূপের মনোহরণ চিত্র। সেইসব রূপ-বর্ণনা নিছক আলঙ্কারিক বর্ণনামাত্র নয়, তা সংশ্লিষ্ট চরিত্রের স্বভাবধর্মের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত এবং উপন্যাসের কাহিনীর অন্ততঃ আংশিক নিয়ামক। সুতরাং তাঁর উপন্যাসে রূপ-বর্ণনার নিহিতার্থ অনেক। রোহিণীকে নিয়ে কৃষ্ণকান্তের সংসারে একদিন আগুন জ্বলেছিলো, সেই আগুনের উৎসমুখ ছিলো রোহিণীর শারীরিক বৃত্তির গভীরে। সে দেহসর্বস্বা, আদিম প্রবৃত্তির ক্রীড়নক। এই স্বভাবের খেলায় সে মেতেছে রূপের সম্বল নিয়ে। তার মাথায় ছিলো 'তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম', তার চোখে চঞ্চল কটাক্ষ, তার 'অধরযুগলে ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি'। বারুণীর দৃশ্যে দেখি 'হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে' রোহিণীসুন্দরী চলেছে। তার মূর্ছিত অবস্থায়ও 'গণ্ড…উজ্জ্বল, অধর…মধুময় বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।' সুতরাং রোহিণীর রূপের বর্ণনায় বঙ্কিম প্যাশন জাগিয়ে তোলার ও ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্র-যুগে নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকটা এগিয়েছে বটে, তবু নারীর দেহরূপের গুরুত্ব একেবারে ম্লান হয়ে যায় নি। তাই বঙ্কিমের কালের মতো প্যাশন সৃষ্টির প্রয়োজন তখন ছিলো না। নারী তখন বিশ শতকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে বঙ্কিমের উপন্যাসে রূপের বর্ণনা যতটা জায়গা জুড়েছে এবং মূল্য পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ততটা জায়গা ও মূল্য পায় নি। তা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় আমরা এমন কিছু দৃষ্টান্ত পাই, যা স্পষ্টতঃই সম্ভোগবাসনার দ্যোতক এবং প্যাশন সৃষ্টির নিপুণ আয়োজন। যোগাযোগ উপন্যাসে শ্যামার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি—'অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে।…বয়স

যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি।…তার টস্‌টসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে।' শ্যামা যে দেহনির্ভর চরিত্র এবং শারীরিকভাবে কামনাপরায়ণা, তার শালীন ইঙ্গিত আছে পরিপুষ্ট শরীর ও টস্‌টসে ঠোঁটের উল্লেখে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রে এসে নারীর রূপ-বর্ণনা সকল প্রয়োজন হারিয়ে শুধু আলঙ্কারিক শোভা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রূপের সঙ্গে চরিত্রের আর তেমন সম্পর্ক নেই; রূপও সম্ভোগের গাঁটছড়া ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে রূপের বর্ণনা নেই, যেখানে আছে সেখানেও দায়সারা গোছের চিত্র পাই। সুরেশের উত্তপ্ত পৌরুষের কাছে অচলার অবৈধ আত্মসমর্পণে যে প্রবৃত্তিবশ্যতার অভিব্যক্তি, অচলার চলনসই নিরুত্তাপ রূপ-বর্ণনার মধ্যে তার ইঙ্গিতমাত্রও নেই। মনে হয়, নারীর যৌনতাকে রূপের চেয়ে আরও গভীরে, তার স্বভাবধর্মের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করেছেন শরৎচন্দ্র। সৃষ্টির আদিম শক্তিকে পূর্বসূরীদের চেয়ে আরও সত্যভাবে দেখবার ও বুঝবার এই চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

এই কথা সাধারণভাবে সত্য হলেও শরৎ-সাহিত্যে এমন কিছু বিরল উদাহরণ আছে যেখানে তিনি সম্ভোগের দৃষ্টিতে নারীর শরীরকে দেখেছেন। ধরা যাক্ পল্লীসমাজের তারকেশ্বর-দৃশ্য। রমা স্নান সেরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, রমেশের সঙ্গে দেখা। শরৎচন্দ্র এর বর্ণনায় লিখেছেন—'মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে?' এর আগের দৃশ্যে যে রমেশ রমার প্রতি বেশ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলো, তাকে রমার প্রতি আকৃষ্ট করার কৌশল হিসেবে শরৎচন্দ্র সিক্তবসনার 'উদ্দাম যৌবনশ্রী' বর্ণনার সুযোগ নিয়েছেন। এখানে যৌনতা রূপবর্ণনার নিহিতার্থ। এই সিক্তবসনা রমার বর্ণনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সিক্তবসনা বিরাজ বৌর বর্ণনাও—'…একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্ণাভমণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার (রাজেন্দ্রকুমারের) চক্ষু পড়ে। …বিরাজ নিঃশঙ্ক চিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ-কলস তুলিয়া লইয়া উপর দিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। …মানুষের এত রূপ হয়, সহসা একথাটা যেন সে (রাজেন্দ্রকুমার) বিশ্বাস করিতে পারিল না। অপলকদৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি

মগ্ন হইয়া পান করিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্রবসনে কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।' এও কামাতুরতার চিত্র, নারীর রূপবর্ণনার সাহায্যে সম্ভোগবাসনা জাগাবার সাহিত্যিক কৌশলমাত্র। শরৎচন্দ্র এ ধরনের চিত্রে যৌনতার দিকে একটুক্ষণের জন্য হলেও তাকিয়েছেন।

শরৎ-সাহিত্যে প্রবৃত্তিময়ী যে কয়েকজন নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার মধ্যে চরিত্রহীনের কিরণময়ীর রূপবর্ণনার দিকে শরৎচন্দ্র বিশেষ মনঃসংযোগ করেছিলেন বলে মনে হয়। বর্ণনা এখানেও দীর্ঘ নয়, কিন্তু সংকেতপ্রধান ও তাৎপর্যময়। সময় সন্ধ্যা, স্থান পাথুরেঘাটার এক সংকীর্ণ গলি। পথের পাশে দুর্গন্ধ-পঙ্কিল খোলা নর্দমা। ইট-খসা জীর্ণ তের নম্বরের বাড়ি। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেলো এবং একটা ক্ষীণ আলোর রেখা পথের ওপর এসে পড়লো। সেই স্তিমিত আলোয় কিরণময়ীর সঙ্গে উপেন্দ্র-সতীশ এবং পাঠক সম্প্রদায়ের প্রথম সাক্ষাৎকার। শরৎচন্দ্রের ভাষায়—'স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিপা হাতে করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্ন-রচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তাহার একটি মাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচাপোকার টিপ চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে।' এই বর্ণনায় কিরণময়ীর প্যাশন বা যৌনতাকে লেখক ছড়িয়ে দিয়েছেন তার সযত্ন-রচিত কবরীতে, কাঁচাপোকার টিপে, আনত চোখের বিদ্যুৎপ্রবাহে, ওষ্ঠাধরের হাসির রেখায়। স্বামী যার মৃত্যুশয্যায়, রূপের মোড়কে তার এই যৌনতার চেহারা দেখে সতীশ প্রথম দর্শনেই কিরণময়ীকে 'প্রেতলোকের পিশাচ' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি।

পাঁচ

এই ধরনের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র যৌনতার পরোক্ষ আভাস দিয়েছেন মাত্র, যৌনতার মতো একটি কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন নি। যৌনতার প্রকোপ

যেখানে অনিবার্য ছিলো সেখানেও তিনি অনেক সময় যৌনতার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছেন। যেমন দেবদাস-পার্বতী, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, সতীশ-সাবিত্রীর ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্রও আছে যেখানে বিষয়টিকে তিনি এড়িয়ে যান নি বরং তাকে নিজের বুদ্ধি ও রুচি অনুযায়ী রূপ দিয়েছেন। আমরা একে একে সেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করছি।

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্র কোনো এক নিরুদিদির পদস্খলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেছেন। অনেকেই মনে করেন, এই কাহিনীর পেছনে সত্য ঘটনা আছে। লেখক নিজেই নাকি মেদিনীপুরের এক সভায় প্রসঙ্গটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নিরুদিদি ছিলেন একজন বালবিধবা। সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তার মতো সেবাপরায়ণা পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেউ ছিলো না। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাকে বড়ো কম ভালোবাসতো না। কিন্তু সেই নিরুদিদির তিরিশ বছর বয়সে হঠাৎ পদস্খলন হলো। তখন পাড়ার কোনো লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলে ধরবার জন্য হাত বাড়ায় নি, এমন কি বাগানের মধ্যে যে মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করতেন সেই ঘরে তার মৃত্যুশয্যার পাশে কিশোর শ্রীকান্ত ছাড়া আর কেউ ছিলো না। এই ঘটনার যে বিবরণ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রীকান্তের মুখে শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তাতে একটিও নিন্দাসূচক শব্দ নেই। বরং সমস্ত বর্ণনার মধ্যে একটা সহানুভূতির সুর যেন ছড়িয়ে আছে। আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—'দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই এক প্রান্তে অন্তিম-শয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়-মাস-কাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোনো স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।'

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই মনে হয়, শরৎচন্দ্র নিরুদিদির যৌনক্ষুধাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন নি। নারী শরীরে যে সৃষ্টির কামনা নিয়ে পৃথিবীতে আসে, এমন কি বালবিধবার ক্ষেত্রেও কোনো নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে সেই কামনাকে

তিনি অস্বীকার করেন নি। আর মনুষ্যত্বের বিচারেও এটাকে নিন্দার যোগ্য বলে তাঁর মনে হয় নি। মেদিনীপুরের উল্লিখিত সভাতে শরৎচন্দ্র নাকি বলেছিলেন—'এই যে ব্যাপারটা দেখা গেল, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দিদির হয়ত সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তার নারীত্বও থাকবে না কেন? মানুষের রোগে শোকে সেবা করে, দীন দুঃখীকে দান করে, যে মহত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার কি কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই? নারীর দেহটাই সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বালবিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে না-ই পেরে থাকে তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না?'[৩] সুতরাং একথা নিশ্চয় করে বলা যায়, শরৎচন্দ্রের যৌনতার প্রশ্নটিকে এখানে সম্পূর্ণ মানবিক ও স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন।

ছয়

এর পরে বিচার করা যাক্ সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র কিরণময়ীর কথা। এই নারীর যে রূপ বর্ণনা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তাতে প্যাশনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। 'এই নিরুপমা, এই লীলা কৌশলময়ী তেজস্বিনী' যুবতীর জীবন-যৌবন একেবারেই তৃপ্ত করতে পারে নি তার স্বামী ক্ষীণজীবী দরিদ্র মাষ্টার হারানচন্দ্র। তাই সে তার অতুলনীয় রূপরাশি নিয়ে স্বামীর ভূতুড়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে অনেকদিন করে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার সেই উপবাসী জীবনে স্বামী ছাড়া যে পুরুষ প্রথমে এলো সে হচ্ছে অনঙ্গ ডাক্তার। হারানচন্দ্রের চিকিৎসার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু তার অর্থসংস্থান ছিলো না। তাই কিরণময়ী তার রূপের ফাঁদে ডাক্তারকে বন্দী করে বিনা পয়সায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছিলো। সুতরাং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কিরণময়ী 'প্রয়োজনের অনুরোধেই' নিজের ঘরে ডেকে এনেছিলো পাপ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই কি সব? তার পেছনে নিশ্চয় ছিলো তার ক্ষুধিত যৌবনের তাগিদ, 'কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা।' তা-ই যদি না হবে তবে যেদিন ডাক্তারের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিলো সেদিনই তাকে এক কথায় কিরণময়ী তাড়িয়ে দিতে পারে নি কেন? শরৎচন্দ্র বলেছেন—'...এই বীভৎস বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার

মত জোর সে নিজের মধ্যে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই। এমনি করিয়া দিন বহিয়া গিয়াছে—অনুক্ষণ সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই।' আসলে একটা প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্যাশনের বাঘবন্দী খেলা শুরু করেছিলো কিরণময়ী।

সেই খেলার অবসান হয় উপেন্দ্রের আবির্ভাবে। কিন্তু প্যাশনের রক্তবীজ তো শেষ হয় না, তার শৃঙ্খল থেকে মানুষের তো মুক্তি নেই। কিরণময়ীরও কখনও মুক্তি হয় নি। তাই উপেন্দ্রকে দেখার পর যখন তার হৃদয় সকল সুখদুঃখ সেই সদ্যপরিচিতের হাতে নিঃশঙ্ক-চিত্তে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখন সুরবালার প্রতি উপেন্দ্রের অপরিসীম ভালোবাসার বৃত্তান্ত শুনে কিরণময়ীর প্রতিক্রিয়া সেই প্যাশনের দিকটাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

'কিরণময়ী আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ছোটবৌ (সুরবালা) দেখতে কেমন ঠাকুরপো? খুব সুন্দরী?

হাঁ, খুব সুন্দরী।

কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার মতন?

সতীশ মুখ নীচু করিয়া রহিল। খানিক পরে কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এ-কথা সত্যিই জানতে চান?

সত্যি বই কি ঠাকুরপো।

সতীশ বলিল, দেখুন, আমার মতামতের বেশি দাম নেই। কিন্তু যদি থাকে, তাহলে এই বলি আমি, আপনার মত রূপ বোধ করি পৃথিবীতে আর নেই।'

শরৎচন্দ্র এখানে কিছুই অস্পষ্ট রাখেন নি। কিরণময়ীর প্রধান সম্বল তার অনুপম রূপ এবং সেই রূপকে ধরে আছে একটা প্রবল প্রবৃত্তি। কিরণময়ীর ভাবনা, সে কি আপন রূপ-যৌবন দিয়ে উপেন্দ্রের মনকে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না?[৪] সুতরাং উপেন্দ্রের প্রসঙ্গেও আমরা কিরণময়ীর মধ্যে দেখতে পাই একটা তীব্র মিথুনাসক্তি, হয়ত তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনের কিছু মধুর অনুভূতি। সে প্রেম বলতে বুঝতো মিথুনাসক্তিকেই, একথা তার মুখেই আমরা শুনেছি!

৪. 'প্রেয়সী ভার্যার যে অমূল্য ঐশ্বর্যকে উপেন্দ্র ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে নাই, সে যে কিছুই নয়, তাহাকে সে যে চক্ষের নিমিষে পরাস্ত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহারই চক্ষের উপর ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর প্রতিহিংসার মত গড়াইয়া বেড়াইতেছিল।'—চরিত্রহীন, ২৬ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু কিরণময়ীর প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। সে উপেন্দ্রের কাছ থেকে পেলো শুধু ঘৃণা ও ধিক্কার। পরিণামে ঘটলো দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ীর আরাকান পলায়ন। এই বিস্ময়কর ঘটনাকে সকল সমালোচকই উপেন্দ্রের প্রত্যাখান ও ঘৃণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। এর মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন একটা প্রবল প্রতিশোধ-স্পৃহা — দিবাকরকে সর্বনাশের পথে টেনে এনে উপেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, কিরণময়ী যেদিন খোলাখুলিভাবে ভালোবাসা জানিয়েছিলো সেদিন উপেন্দ্র সরব প্রতিবাদও করেন নি—প্রত্যাখ্যান তো দূরের কথা। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, সুরবালার গভীর প্রেমের বর্ম এঁটেই তিনি আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু যেদিন সত্যিই উপেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া গেলো রাগ ও ঘৃণা, সেদিন বুদ্ধিমতী কিরণময়ীর বুঝতে কষ্ট হয় নি যে, উপেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ দিবাকরকে নিয়ে। এখানে প্রশ্ন, দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ীকে সন্দেহ করার মতো কি কিছুই ছিলো না? যদিও কিরণময়ী প্রতিবাদ করে বলেছে— 'সমস্ত মিথ্যে! ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি ভাবতে পারলে!'— তবু পাঠক হিসেবে মনে হয়, দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ীর কিছু অপরাধের খেলা ছিলোই। স্মরণ করুণ, নির্জন দুপুরে তার শোবার ঘরে, রান্নাঘরে দুজনের কত আলোচনা—রূপ, রূপের পিপাসা, ভালোবাসা নরনারীর সৃজন-সম্পর্ক, প্রবৃত্তির তাড়না ইত্যাদিই হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে সেই দিনের কথা, যেদিন কিরণময়ী দিবাকরকে বলেছিলো— 'সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী, তা-ই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা।' কিন্তু বলতে বলতে সে লক্ষ্য করলো, দিবাকরের স্তব্ধ মুখের উপর নবীন যৌবনের একটা সদ্য-জাগ্রত ক্ষুধার মূর্তি। তবু তা দেখে যে সাময়িক সঙ্কোচ কিরণময়ীর হয়েছিলো তা স্পর্ধার সঙ্গে অতিক্রম করে সে বলেছে—'এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার (নরনারীর) রূপ-যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।' সুতরাং এটা স্পষ্ট—যে দিবাকর উপেন্দ্রের আদেশে বিয়ে করতে চায় নি, সেই দিবাকরের দেহে ক্ষুধার বাসনা ও চিত্ততলে নারীর ছায়া জাগিয়ে তোলার অপরাধ ছিলো কিরণময়ীর। হাসি-ঠাট্টায় সে প্রতিদিন দিবাকরকে আকর্ষণ করেছে নিজের মনোহরণ রূপের দিকে— যে পাকচক্র থেকে পালাবার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর পরিণামে আমরা দিবাকরের মুখে শুনতে পেয়েছি—'সত্যি বলছি বৌদি, এমনি যদি চিরকাল তোমার কাছে থাকতে পাই ত আর আমি কিছু চাইনে।' সুতরাং কিরণময়ী

যতই অস্বীকার করুক, সে বৈধব্যের তৃষিত দেহমন নিয়ে জ্ঞাতসারেই দিবাকরের সঙ্গে আগুনের খেলা খেলেছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন—'অপরিণতবুদ্ধি এই তরুণ যুবকটি তাহার প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য-তৃষ্ণায় এই আশ্চর্য নারীর অলৌকিক রূপের পানে যখন আকৃষ্ট হইতেছিল, কিরণময়ী তখন দেখিয়াও দেখে নাই, জানিয়াও ভ্রূক্ষেপ করে নাই।' এর সবটুকুই দেবর-বৌদির ঠাট্টা-পরিহাসের বা মধুর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনঙ্গ ডাক্তার, উপেন্দ্র ও দিবাকর সকল ক্ষেত্রেই জৈব প্রবৃত্তির যে অঙ্কুশ-তাড়না আমরা কিরণময়ীর মধ্যে দেখলাম, সে-ই হচ্ছে তার সত্য পরিচয়। সেই পরিচয়েরই প্রবলতর প্রকাশ দেখা গেছে আরাকানে স্টীমার যাত্রার কালে। একথা সত্য যে, দিবাকরকে সে ভালোবাসে নি, বাসা অসম্ভব ছিলো। তবু দিবাকরের ঔদাসীন্যে কিরণময়ী কেন ব্যথা পেয়েছে? দিবাকরের মধ্যে যে মধুচক্র সযত্ন-সঞ্চিত, তার প্রতি তার সতর্ক দৃষ্টিই বা কেন? তার কারণ, দিবাকরের সঙ্গে তার একটা আসক্তির সম্পর্ক ছিলো। সে-আসক্তি উপেন্দ্রের ঘৃণা ও ধিক্কারে আহত হয়ে সর্পিণীর মতো ভয়ঙ্কর সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর পর কিরণময়ীর প্রবৃত্তির উদ্দামতা কোথাও বাধা মানে নি। কাঁচাপোকা যেমন করে পতঙ্গকে টানে তেমনিভাবে অর্ধ-সচেতন দিবাকরকে ঘরের বাইরে এনে স্টীমারে তুলেছে, কেবিনে দিবাকরকে খাওয়াতে খাওয়াতে তার আর্দ্র ওষ্ঠে চুম্বন করেছে, রাত্রিতে এক বিছানায় শুয়ে দিবাকরের বুকের ওপর হাত তুলে দিয়েছে, দিবাকরের নিস্পৃহতা দেখে তাকে সুদৃঢ় বলের সঙ্গে বুকের কাছে টেনে এনে জাহাজ-ডুবিতে এমনি করেই মরতে চেয়েছে। দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ী যে পর্যায়ে উঠেছে, তা কি শুধুই উপেন্দ্রের মাথা হেঁট করে দেওয়ার স্পৃহা থেকে উদ্ভূত? শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কের কাছ থেকে পেয়েছে ব্যর্থতা, কিন্তু তার পরেও তারা বেঁচে রয়েছে বুকের হাহাকার ও চোখের জল সম্বল করে। কিরণময়ী তেজস্বিনী বলে চোখের জল সম্বল না করা অস্বাভাবিক নয়। এমন কি দিবাকরকে নিয়ে পালানোও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু দেহগত কামনার ছাড়পত্র না থাকলে 'তুমিই এখন আমার সর্বস্ব' একথা দিবাকরকে বলা এবং তার সঙ্গে প্রায় বিবাহিতা স্ত্রীর মতো আচরণ করা কিরণময়ীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাদের স্টীমার যাত্রার পূর্ণ বিবরণ পড়ে মনে হয়, সেইসব দিনগুলিতে যদি তাদের যৌন-মিলন ঘটতো তবে তা কিরণময়ীর কাছে, এমন কি পাঠকদের কাছেও অপ্রত্যাশিত বলে মনে হতো না। উপন্যাসটির এই অধ্যায়ে কিরণময়ী জৈব

কামনার এক দুঃসহ মূর্তির মতোই আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করে। শুধু উপেন্দ্রের প্রতি আক্রোশ নিয়ে কিরণময়ীর মতো বুদ্ধিমতী নারী দেহের দিক থেকে দিবাকরের এত কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছোতে পারতো না। কিরণময়ীর এই প্যাশনের দিকটি চিনেছিলো বলেই উপেন্দ্র একদিন বলেছিলো—'ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না—সে সাধ্যই নেই আপনার। শুধু সর্বনাশ করতে পারবেন।'

পাথুরেঘাটায় প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে স্টীমার যাত্রা পর্যন্ত কিরণময়ীর যে চিত্র তা মুখ্যতঃ জৈব প্রবৃত্তির অকপট প্রকাশের চিত্র। শরৎচন্দ্র এতে মনোধর্মী প্রেম নয়, শরীরধর্মী বাসনার তীব্র তপ্ত রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নারীর প্যাশন কতদূর এগোতে পারে তারই একটা পরীক্ষা করলেন লেখক। এ-পর্যন্ত যৌনতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনের সাহস ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা দেখে অবাক হতে হয়। কিন্তু চরম ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দেহমিলনের প্রশ্নে তিনি স্পষ্টতঃই থমকে দাঁড়িয়েছেন। তার কারণ এই নয় যে, তা কিরণময়ীর চরিত্রের ও উপন্যাসের ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম হতো না। আসলে এই থমকে দাঁড়ানোর পেছনে ছিলো শরৎচন্দ্রের নিজের রুচি। প্রেমহীন দেহমিলন যতই স্বভাবসঙ্গত হোক, তা লেখকের রুচিসম্মত ছিলো না। তাই দিবাকরের সঙ্গে দেহমিলন কিরণময়ীর পক্ষে সম্ভাব্য হলেও শরৎচন্দ্র তা ঘটতে দেন নি। না দিন, আপত্তি করছি না—কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনি নীরব থাকলেই পারতেন। পাঠক যা হোক একটা কিছু বুঝে নিতো। কিন্তু শরৎচন্দ্র আরাকান-দৃশ্যে ঘোষণা করলেন, কিরণময়ীর দেহ নষ্ট হয় নি এবং তার দেহের ওপর দিবাকরের লুব্ধ দৃষ্টিও সে আর সহ্য করতে পারছে না। শুধু উপেন্দ্রের সর্বনাশ করছে ভেবেই সে এক সময় তার দেহ দিয়ে অনঙ্গের মতো দিবাকর নামক পতঙ্গকে মজাতে চেয়েছিলো। এই সব কথা পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র আরাকান-দৃশ্যে কিরণময়ীকে দিয়ে অনেক কথা বলিয়েছেন। তারপর আর মনোধর্মী প্রেমের প্রতিষ্ঠায় কোনে- অসুবিধা হলো না, প্রায়-উন্মাদিনী হলেও কিরণময়ীকে ফিরিয়ে নেওয়া গেলো সংসারের মধ্যে, উপেন্দ্রের পাশে।

কিন্তু এতে শরৎচন্দ্রের মনোগত তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠায় যতই সুবিধা হোক, কিরণময়ীর জীবনের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর সম্ভাব্য দেহমিলন সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অনীহা শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই পাঠকের চোখে ধরা পড়েছিলো। চন্দননগরের এক সভায় জবাবদিহি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র

বলেছিলেন—'মেয়েটি যদি দেহ নষ্টই করত তাতেও আমার কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ওই চরিত্রটা একেবারে অসত্য হয়ে যেত। অমন লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিতা মেয়ে, আর যে বালকের সঙ্গে সে কেবল একটা জিদের বসে পালিয়ে এলো, সে একটা অপোগণ্ড শিশু বললেই হয়, যাকে সে কোন দিক দিয়েই নিজের সমকক্ষ মনে করে না তাকে তাকে দিয়েই যদি সে নিজের দেহটা নষ্ট হতে দিত তা হলে ও-চরিত্রটা মাটি হয়ে যেত।'[৫] কিন্তু আমার মনে হয়, সেই তথাকথিত শিশুর সঙ্গে স্টীমার যাত্রায় কিরণময়ী যা করেছে, তা দেহ নষ্ট করার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়া দিবাকর কিরণময়ীর চেয়ে বয়সে ছোট হলেও ঠিক অপোগণ্ড শিশু ছিলো না। সে বি. এ. ফেল করেছে এবং তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তাই দিবাকরের দ্বারা দেহ নষ্ট হলে কিরণময়ীর চরিত্র অসত্য হয়ে যেতো, একথা ঠিক নয়। বরং নষ্ট না হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে শরৎচন্দ্র যেভাবে তাকে উপেন্দ্রের সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন তাতেই কিরণময়ীর চরিত্রের সত্য মিথ্যা হয়ে গেছে। সে যাই হোক, যৌনতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজের স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে শেষরক্ষা করতে না পারলেও তিনি এর অনেক অংশেই যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা আজকের আধুনিক মনকেও যথেষ্ট আকর্ষণ করে।

সাত

এবার ধরা যাক্ অভয়ার কথা। স্বামী-পরিত্যক্তা অভয়া রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে বর্মা এসেছে এবং শ্রীকান্তের কৃপায় স্বামীর সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে ঘর করতে এগিয়ে গেছে। সতীন নিয়ে বাস করতেও তার কোনো দ্বিধা ছিলো না। তার স্বামী যদি একটু সহিষ্ণু ও সহানুভূতিশীল হতো তবে অভয়া দু'একটি সন্তানের মা হয়ে স্বামীর গৃহেই হয়তো জীবন কাটিয়ে দিতো। মা হওয়ার বাসনা সব মেয়েরই থাকে, তারও ছিলো। কিন্তু জৈবিক প্রবৃত্তির প্রবলতা বা যৌনক্ষুধার উদ্দামতা বলতে আমার যা বুঝি তা অভয়ার ছিলো বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে সে স্বামীগৃহে থেকে চলে এসেছে এবং রোহিণীর সঙ্গে একত্র বাস করতে শুরু করছে। এখানেই অভয়ার বিদ্রোহ। যে স্বামী-সংস্কার তাকে বর্মায় টেনে এনেছিলো, তা থেকে সে এখন মুক্ত। সে আজ বিশ্বাস করে, এক দিনের বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ তার আর পত্নীত্বের অধিকার, মা হওয়ার অধিকার হরণ করতে পারে না।

৫. ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবর্তক' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, রোহিণী-অভয়ার অবৈধ মিলন কেন ঘটতে দিলেন শরৎচন্দ্র? 'দিবাকর-কিরণময়ীর ক্ষেত্রে যে রুচিগত ও আদর্শগত আপত্তি তিনি গ্রাহ্য করেছিলেন, সেই আপত্তি রোহিণী-অভয়ার ক্ষেত্রে উঠলো না কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, দিবাকর-কিরণময়ীর ক্ষেত্রে কোনো ভালবাসার সম্পর্ক ছিলো না। আর যে মিলন ভালোবাসার মধ্যে ঘটে না, শরৎচন্দ্রের তার প্রতি কোনো সায় ছিলো না। কিন্তু যেখানে উভয়তঃ ভালোবাসা আছে সেখানে অবৈধ মিলনও তাঁর একেবারে অনভিপ্রেত নয়। উপন্যাসে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, রোহিণী অভয়াকে ভালোবাসে। অভয়া রোহিণীকে ভালোবাসে কি না সেটা স্পষ্ট করে কোথায়ও বলা হয় নি, অবশ্য তার স্বামী-সন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বলার সুযোগও ছিলো না। তবে রোহিণী সম্বন্ধে অভয়ারও নির্ভরতা ও প্রসন্নতা যে ছিলো তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সে নিজেই শ্রীকান্তকে বলেছে—'তাঁর (রোহিণীর) ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।...আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা কিছু বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না।...তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের চেয়ে বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই।' যারা নিষ্পাপ ভালোবাসার সন্তান, তারা ভালোবাসার সত্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই অর্থে তারা জগতে কারও চেয়ে ছোট নয়—অভয়ার এই বলিষ্ঠ বক্তব্যের ওপর শরৎচন্দ্র রোহিণী-অভয়ার মিলনকে দাঁড় করিয়েছেন। নরনারীর স্বাধীন যৌন-অধিকার তিনি এই শর্তে মেনে নিতে প্রস্তুত যে, তাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, ওটা অভয়ার বক্তব্য, শরৎচন্দ্রের নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই অবৈধ মিলনের ঘটনাটা তিনি উপন্যাসে ঘটতে দিয়েছেন। এটা কম গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকান্ত, যাকে শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রক্ষেপ বলে মনে করা হয়, তার প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করা যেতে পারে। সত্য বটে, শ্রীকান্ত প্রথমে অভয়ার কথায় সায় দিতে পারে নি, কারণ এ ধরনের ঘটনায় সমাজের কাজকর্ম, শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙে যায়। তাছাড়া তার মনে

পড়েছিলো সেই অন্নদাদিদি ও রাজলক্ষ্মীর কথা যারা বিদ্রোহ করে নি, দুঃখ মাত্র সম্বল করে জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু শ্রীকান্ত নিন্দাও করে নি। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, নীতি-দুর্নীতি সব কিছুকেই দেখে শুনে বিচার করা উচিত বলে তার মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এক সময় তার মনে হয়েছে, অভয়া যার মা হবে তাকে দুর্ভাগা বলে ভাবতে অন্ততঃ সে কোনো মতেই পারবে না। অভয়ার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সহস্র কোটি নমস্কারও সে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, মরণাপন্ন অবস্থায় সে অভয়ার দ্বারে গিয়েই দাঁড়িয়েছিলো। তাই মনে হয়, রোহিণী-অভয়ার শরীরের অধিকার ও যৌন-বিদ্রোহ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্তের মনেও কোনো অস্বচ্ছতা ও গ্লানি ছিলো না।

আট

এক দুর্যোগের রাত্রিতে গৃহদাহের অচলা ও সুরেশের অবৈধ মিলনের মধ্যে যে যৌন-সমস্যা নিহিত, তা বেশ জটিল। বিষয়টিকে অচলা ও সুরেশ উভয়ের দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। অচলার সঙ্গে পরিচয়ের অব্যবহিত পর থেকে সুরেশ অচলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার সম্পর্কে মোহ ও আসক্তির বশবর্তী হয়। সেই প্রবৃত্তির তাড়নাতেই সে মহিমের সঙ্গে অচলার বিয়ের পথে মূর্তিমান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু অচলা শেষ পর্যন্ত সংকল্পে দৃঢ় থাকায় মহিমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। অবশ্য তাতেও অচলা সম্পর্কে সুরেশের আসক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তার দৃষ্টান্ত আছে মহিমের গৃহদাহের সময় ও এলাহাবাদে থেকে অচলাকে নামিয়ে নেওয়ার ঘটনা দুটির মধ্যে। সুরেশ এতকাল শুধু ভেবে এসেছে, কি করে অচলাকে পাবে। তার মনোভাবের মধ্যে নিছক যৌনতাই যে অনেকখানি ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার সেই যৌন-অভিলাষ তৃপ্ত হয় এক ঝড়ের রাত্রিতে। কিন্তু অভীপ্সিত যৌন-মিলনের পরেই সে বুঝতে পারে যে, অচলার দেহটাকেই সে শুধু পেয়েছে, তার মন পায় নি। তাই সে অচলাকে বলেছিলো—'ভেবেছিলাম, তোমার দেহটাকে কোনমতে পেলে মনটাকেও পাবো। তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে হয়ত সত্যিই কোনদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত—হয়ত যা সর্বস্ব দিয়ে এমন করে চেয়েছিলাম, তাই তুমি একদিন নিজের ইচ্ছেয় ভিক্ষে দিতে, কিন্তু আর তার সময় নেই, আমি অপেক্ষা করার অবসর পেলাম না।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনহীন দেহ সম্পর্কে

শরৎচন্দ্রের যে রুচিগত ও আদর্শগত বিরূপতা ছিলো, সুরেশের ক্ষেত্রেও তিনি তাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। এখানে কোনো নতুন দৃষ্টিকোণের পরিচয় নেই।

কিন্তু অচলার দিক থেকে এই যৌন-মিলনের তাৎপর্য ভিন্নতর। সে শিক্ষিতা নারী। ব্রাহ্ম সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে বলে পুরুষজাতি সম্পর্কে হিন্দু নারীর তুলনায় সে অধিকতর প্রগতিশীলা। সে ভালোবেসে স্বামী নির্বাচন করেছে এবং বিয়ের আগে স্বামীর বন্ধু সুরেশের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে। কিন্তু তার জীবনের এই প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও ভারতীয় নারী হিসেবে স্বামী সম্পর্কে একনিষ্ঠ হওয়ার একটা সংস্কার তার মধ্যে থাকা স্বাভাবিক ছিলো। সে নিজেও সুরেশের কাছে একদিন গর্ব করে বলেছিলো—'সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু। এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামীত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না।' অবশ্য মৃণালের সতীত্ব নিয়ে সুরেশের বড়াইয়ে কতকটা অপমানিত বোধ করেই অচলা নিজের সম্পর্কে এই গর্বিত উক্তি করেছিলো। যাকে সে একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো তার সম্পর্কে একটা নিষ্ঠা আমরা স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করতে পারি।

এবার সেই দুর্যোগের রাত্রির কথা ধরা যাক। রামবাবু জানতেন অচলা সুরেশের বিবাহিতা স্ত্রী। তাই রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি একজন অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে অচলাকে ঘুমোবার জন্য সুরেশের ঘরে যেতে বার বার অনুরোধ করেছিলেন। পরপুরুষ সুরেশের ঘরে শোওয়ার জন্য যাওয়ার অর্থ কি, তা অচলার অজানা ছিলো না। তাতে সতীত্ব হারানোর সম্ভাবনা ছিলো। আর অচলা যদি সুরেশের শোয়ার ঘরে না যেতো এবং সে যে সুরেশের স্ত্রী নয় একথা খুলে বলতো, তবে রামবাবুর কাছে তার সম্ভ্রম হারিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার যে বহির্বাস অঙ্গে ধারণ করে সে বিচরণ করছিলো তা নিঃশেষে খসে পড়তো। এই দুই বিকল্পের মধ্যে, আশ্চর্যের বিষয়, অচলাকে প্রথমটিই নির্বাচন করতে দেখি। অর্থাৎ সুরেশের শয্যায় গিয়ে সে আত্মহত্যা করে বসলো। মৃণালের সামনে যদি কোনোদিন এই দুই বিকল্প দেখা দিতো তবে সে নিঃসংশয়ে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করতো। সম্ভ্রম হারানোর চেয়ে সে সতীত্ব রক্ষা করা নিশ্চয় বড়ো বলে মনে করতো। কারণ স্বামী জিনিষটি তার কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে অচলার সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয়, সে সতীত্বকে অত্যাজ্য নিত্য ধর্ম বলে মানে নি। অন্যের

স্ত্রী হয়েও সে পরপুরুষের সঙ্গে যৌন-সংযোগ করাকে বড়ো রকমের অপরাধ বলে ধরে নেয় নি। অবৈধ যৌন-জীবন সম্পর্কে এই উদারতা বা শিথিল মনোভাব অচলার মধ্যে শরৎচন্দ্র দেখাবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে করি। গুরুতর ঘটনাটির কিছু পরে অচলার মনোভাবের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তা থেকে মনে হয়, বাইরে সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে বেঁচে থাকার মোহে এই গোপন যৌন-সংযোগকে অচলা যেন মেনে নিতে প্রস্তুত। এখানে তার চরিত্র যেন অনেকটা আধুনিক সাহিত্যের সেইসব নায়িকার মতো বাইরে যাদের সম্ভ্রান্ত বেশ ও মুখোশ, কিন্তু ভেতরে যাদের আছে পাপের গোপন ইতিহাস। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সেই রাত্রিতে অচলার সিদ্ধান্তের মধ্যে আধুনিক মনোভাবের পোষকতা আছে।

যদিও অচলার এই আচরণের উৎস হিসেবে প্রবৃত্তির তাড়নার কথা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের কোথায়ও বলা হয় নি, তবু পূর্বাপর তার চরিত্র এবং সুরেশ সম্পর্কে তার মনোভাব বিশ্লেষণ করলে তা কিন্তু অসম্ভব বলে মনে হয় না। সুরেশের দৃপ্ত উদ্দাম পৌরুষ সম্পর্কে একটা মোহ তার বরাবরই ছিলো। সেই মোহের ভেতরে দেহগত আসক্তির বীজ থাকাও অস্বাভাবিক ছিলো না। হয়ত সেই রাত্রিতে অচলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সেই দেহগত আসক্তি গোপন থেকে সুরেশের শয্যায় আত্মহত্যার দিকে অচলাকে ঠেলে দিয়েছিলো। যদি এই মত গ্রাহ্য হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, শরৎচন্দ্র জৈব প্রবৃত্তির দুর্মরতা ও গোপন তাড়নার একটি দৃষ্টান্ত দেখালেন অচলার মধ্যে। আদিশক্তির ক্রিয়াকলাপকে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এখানে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুর্যোগের রাত্রির পর অচলার প্রতিক্রিয়ার কথা নিশ্চয় উঠবে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, রামবাবু খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, অচলা বাইরেরে টেবিলের ওপর মাথা পেতে বসে আছে। তার মুখ মড়ার মতো শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং সেখান থেকে অশ্রু ঝরছে। শুধু তাই নয়, তার যেন একটা অর্ধমৃত নারীদেহ। স্পষ্টতঃই পূর্ব রাত্রির অভিজ্ঞতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বোঝাবার জন্য লেখক এই বর্ণনা দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি যৌনতা সম্পর্কে অচলা উদার দৃষ্টির এবং সুরেশ সম্পর্কে আসক্তির অধিকারী হবে তবে তার এই বিপরীত প্রতিক্রিয়া হলো কেন? এর উত্তর হচ্ছে, অচলা সেই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত যৌন-জীবন সম্পর্কে যে উদারতা ও সুরেশ সম্পর্কে যে আসক্তিই পোষণ করুক না কেন, সেই ঘটনার মুহূর্তেই সে উপলব্ধি করেছিলো,

সে স্বামীকে কত ভালবাসে। তাই সুরেশের সঙ্গে ভালোবাসাহীন যৌন-মিলনে সে ভেঙে না পড়ে পারে নি। আসলে যৌনতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে যে বক্তব্য পাওয়া যায়, এখানে শেষ পর্যন্ত সেই বক্তব্য ফিরে এসেছে।

নয়

শেষ প্রশ্নের কমল চরিত্রে যৌনতা-বিষয়ে শরৎচন্দ্র আরও এক ধাপ এগিয়েছেন। উপন্যাসটিতে নায়িকার জীবনদর্শনের যে পরিচয় ও ব্যাখ্যা পাই তাতে দুটো কথার প্রাধান্য—প্রেম ও যৌনতা। এখানে শরৎচন্দ্র যে সজ্ঞানে প্রেম ও যৌনতাকে এক সঙ্গে গ্রথিত করে উপস্থাপিত করেছেন তার ইঙ্গিত তাঁর চিঠিতে আছে—'শেষ প্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করছি। "খুব করবো, গর্জন কোরে নোঙ্‌রা কথাই লিখবো" এই মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়— এরই একটু নমুনা দেওয়া।'[৬] অন্যত্রও লিখেছেন—'(শেষ প্রশ্ন থেকে) তোমরা এই আভাসটুকু হয়তো পাবে যে নোঙ্‌রা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে।'[৭] এই সব পত্রে নোঙ্‌রা না করেও আধুনিক সাহিত্য লেখার যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, যৌনতা শেষ প্রশ্নের মুখ্য বিষয়বস্তু। স্মরণ রাখতে হবে, অতি-আধুনিক সাহিত্যে তখন মিথুনাসক্তির নামে অনেক নোঙ্‌রামি চলছিলো।

কমলের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় ও তার বাস্তব জীবনায়নে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে সংসারের আর সব জিনিষের মতো প্রেমও চিরস্থায়ী নয়। যতদিন প্রেম থাকে ততদিন তা সত্য। প্রেম যখন চলে যায়, তখন তা নিয়ে হা-হুতাশ করা বৃথা; তাকে বেঁধে রাখার চেষ্টাও নিরর্থক। অন্যদিকে একজন নারী একজন পুরুষকে ভালোবেসে তার সঙ্গে একত্র বাস করতে পারে। যদি সেই ভালোবাসা চলে যায় তবে অন্য পুরুষকে ভালোবাসার এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অধিকার তার থাকে। নরনারীর এই ভালোবাসার মিলনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রশ্নটা বড়ো নয়। নিজের জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে কমল দেখিয়েছে, তার প্রথম বিবাহ হয় এক অসমীয়া খ্রীষ্টানের সঙ্গে, সেখানে

৬. দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, একাদশ সম্ভার।

৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র (১৩৬১)।

বোধ হয় বিবাহের খ্রীষ্টীয় রীতি মানা হয়েছিলো। তারপর সে ভালোবেসে গ্রহণ করে শিবনাথকে। এক্ষেত্রে শৈব বিবাহের মতো একটা অনুষ্ঠান হয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে ফাঁকি রয়ে গেছে একথা শুনেও কমল কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। কারণ তার কাছে ভালোবাসাই বড়ো— বিবাহ নয়। তারপর শিবনাথের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সে আবার ভালোবেসেছে অজিতকে এবং বিবাহ ছাড়াই তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করার জন্য শেষ রাত্রিতে মোটরযোগে অন্যত্র যাত্রা করেছে। এই ভালোবাসার ছাড়পত্র নিয়ে বিবাহের বৈধ রীতি না মেনে, কমলের পর পর জীবনসঙ্গী বদলের যে ইতিহাস, তাতে স্বাধীন যৌন-জীবন যাপনের আইডিয়া তুলে ধরা হয়েছে। সে আইডিয়া নিশ্চয় লেখকের সমকালের ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন থেকে উদ্ভূত হয় নি। তা শরৎচন্দ্র বুদ্ধির সূত্রে আমদানি করেছেন পাশ্চাত্য দেশ থেকে। তাই এদেশের সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে এই স্বাধীন মিলনতত্ত্ব যে বিপ্লবাত্মক আদর্শের রূপ ধরেছে, তা স্বীকার করতেই হবে। সেটা বুঝেই লেখক বাংলার সমাজ থেকে অনেক দূরে আগ্রায় কাহিনীর আসর বসিয়েছেন এবং কমলের জন্মের অবৈধ ও অভারতীয় উৎস সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে পাঠকের সম্ভাব্য প্রবল প্রতিক্রিয়াকে সংযত রাখার চেষ্টা করেছেন।

কমলের স্বাধীন মিলনতত্ত্ব কিন্তু কোনো নোঙ্‌রা যৌন-চিত্রের আকারে উপন্যাসে আসে নি। কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের মতো শরৎচন্দ্র কমলের কামপীঠগুলির বর্ণনা দেন নি এবং তার যৌন-জীবনের রোমহর্ষক চিত্র উপস্থাপিত করেন নি। নোঙ্‌রা না করেও আধুনিক সাহিত্য লেখার যে সংকল্প তিনি নিয়েছিলেন, তারই জন্য এ-বিষয়ে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় উপন্যাটিতে আছে।

কিন্তু স্বাধীন যৌন-জীবনের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই প্রজননের যে সামাজিক সমস্যা জড়িত, সে-সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট কথা শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র বলেন নি। পাশ্চাত্য দেশে এই বিবাহহীন স্বাধীন যৌন-জীবনের আদর্শ বেশ ব্যাপক হয়েও যে জীবনের বাস্তব সমস্যাকে খুব জটিল ও সামাজিক ভারসাম্যকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলে নি তার কারণ সেখানে স্বাধীন যৌন-জীবন যাপনের সঙ্গে জড়িত যে প্রজননের সম্ভাব্যতা, তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে শাসন করার ব্যাপক চেষ্টা চলেছে। জন্মশাসন পদ্ধতি চালু হয়েছে বলে বার বার জীবনসঙ্গী বদলের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় নি। কমলের অনেক ভাবনার মধ্যে, অনেকের সঙ্গে তার নানা আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গটি কখনও প্রকাশ্যভাবে ওঠে নি। কিন্তু

কমলের কোনো কোনো উক্তি এ সম্পর্কেও আমাদের একটু ভাবিয়ে তোলে। নিজের মায়ের প্রসঙ্গে কমল বলেছে, তাঁর রূপ ছিলো বটে, কিন্তু রুচি ছিলো না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বাগানের বড়ো সাহেবের সঙ্গে কমলের মায়ের সম্পর্ক ছিলো ভালোবাসাহীন এবং সেই অর্থে রুচিহীন। দ্বিতীয়তঃ দেহগত ব্যাপারে রুচি ছিলো না বলে বড়ো সাহেবের ঘরে কমলকে গর্ভে ধারণ করার দায় থেকে তিনি মুক্ত থাকতে পারেন নি। আর নিজের সম্পর্কে কমল এক রাত্রিতে অজিতকে বলেছিলো—'চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা আমি তাদের জাত নই।' এই উক্তিতে কমল বোধ হয় একথাই বলতে চেয়েছে যে, দেহের ব্যাপাবে কোনো বিবাহের সংস্কার না মানলেও তার সংযম আছে—তাই সে দেহকে নির্বিচারে ভোগের বস্তু করে তুলতে চায় না। আর সে-কারণেই একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলন কোনো প্রজনন-সমস্যা কমলের জীবনে সৃষ্টি করে নি। যদি এই ব্যাখ্যা ঠিক হয়, তবে মানতে হবে যে, স্বাধীন যৌন-জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সংযমের কথাটা টেনে এনে তার বাস্তব সমস্যাটাকে শরৎচন্দ্র কতকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন।

দশ

শেষ প্রশ্নের স্বাধীন মিলনতত্ত্বে ভালোবাসার শর্ত বজায় রেখে শরৎচন্দ্র যে স্তরে তাকে রেখেছিলেন, শেষের পরিচয়ে সেই ভালোবাসার শর্ত সরিয়ে নেওয়ায় সেই স্তরের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। সবিতা নামে এক বিবাহিতা রমণীকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে এক নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সবিতার বিবাহ হয় ব্রজবাবুর সঙ্গে। সে ছিলো গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, ব্রজবাবুর সকল আত্মীয়ের চেয়ে বড়ো আত্মীয়, সকল বন্ধুর চেয়ে বড়ো বন্ধু। তাদের একটি মেয়েও হয়। কিন্তু সেই সবিতাই এক রাত্রিতে রমণীবাবুর ঘরে প্রবেশ করে এবং তার বিবাহিত জীবনের সতীত্বধর্মের অবসান ঘটায়। তারপর সবিতা বারো তের বছর কাটিয়ে দেয় রমণীবাবুর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে। অথচ সে রমণীবাবুকে কোনোদিন ভালোবাসে নি, কখনও শ্রদ্ধা করে নি, তাকে স্বামীর চেয়ে বড়ো মনে করে নি। বরং এই কামার্ত পুরুষটিকে সে মনে মনে ঘৃণাই করে এসেছে। এমন কি করে হলো, এই প্রশ্নটা তাই সবিতার জীবনবৃত্তান্তের পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে।

এই প্রশ্ন সবিতাকেই করেছে কেউ কেউ। কিন্তু সে কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। উপন্যাসে এ-বিষয়ে যে আলোচনা আছে, তার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

'এবার সারদা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেন নি মা ?

না মা, সেদিনও না— কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হোল কেন ?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা ? ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়।...কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এম্‌নিই হয়।'

অর্থাৎ সবিতার মতে, এ-ধরনের পদস্খলন মানুষের হয়ে থাকে এবং তা ঘটে 'আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়'। এর আগে সে নিজের দুর্গতির জন্য দায়ী করেছে 'গত জীবনের কর্মফলকে'। সবিতা যে-প্রশ্নের ঠিক জবাব খুঁজে পায় নি, তা অনুমান করতে আমাদের কষ্ট হয় না। মানুষ একটা আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। প্রাকৃতিক নিয়মে সেই প্রবৃত্তির উপশম বা অবসান না হওয়া পর্যন্ত জীবনে তার দাপট চলতে থাকে। সেই জৈব প্রবৃত্তি, সেই রক্তের অন্তর্লীন আদিমতা মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও শিক্ষা-সংস্কারকে কখন যে কিভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলবে তা কেউ বলতে পারে না। সেই অন্ধকার আদি-ঐতিহ্যের স্বরূপ তার কাছে সব সময় স্পষ্টও হয়ে ওঠে না। তাই তাকে দৈব ঘটনা বা কর্মফলের মতো মনে হয়। সবিতার ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিলো। সেই রাত্রিতে এই বিবাহিতা নারীর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলো জৈব কামনার পুঞ্জীভূত ভার— যার স্বরূপ তার নিজের কাছেও পরিচিত ছিলো না। তাই নিজের অদৃষ্ট ছাড়া সে আর কাউকে অভিশাপ দিতে পারে নি।

সুতরাং একথা স্বীকার্য যে, শরৎচন্দ্র সবিতার মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির এক চমকপ্রদ প্রকাশ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যৌনতার আকস্মিক আক্রমণে কেমন করে দাম্পত্যের নৈতিক ভিত্তি, তার ধর্মসংস্কার ধ্বসে পড়ে তার এক বিরল দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপিত করলেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে, সেদিনের সেই হঠাৎ পা-পিছলানোর ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু যাকে সবিতা ভালোবাসে না — এমন কি ঘৃণা পর্যন্ত করে— সেই রমণীবাবুর সঙ্গে সে বারো তের বছর কাটিয়ে দিলো কোন্ কারণে, কিভাবে ? একথা ঠিক, বর্তমান আশ্রয় যিনি দিয়েছেন সেই

রমণীবাবুর দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড়ো হোক্, সে-আশ্রয় বিসর্জন দিয়ে শূন্য-হাতে পথে বের হওয়া সবিতার পক্ষে তার চেয়েও কঠিন ছিলো। কিন্তু সেটাই সবিতার পক্ষে একমাত্র কারণ ছিলো, এটাও মনে হয় না। সবিতা নিজেই বলেছে, সে এসে পড়েছে এক গোলোকধাঁধাঁর মধ্যে যার বাইরের পথ কেউ আজও বার করতে পারে নি। এই গোলোকধাঁধাঁ হচ্ছে যৌনতার পাকচক্র। সেই পাকচক্রে বারো তের বছর অভ্যাসের বশে ঘুরে মরেছে সবিতা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, যৌন-অভ্যাসও এক মারাত্মক ব্যাধি, যা মন-প্রাণের বিরোধিতা সত্ত্বেও অক্টোপাসের মতো মানুষকে ঘিরে রাখে। তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে একমাত্র তার চেয়েও জোরালো কোনো শক্তি। সেই শক্তি যেদিন বিমলবাবুর ভালোবাসার বেশে এলো সেদিনই রমণীবাবুর কাম-বেষ্টনী থেকে মুক্তি ঘটেছে সবিতার। তার পূর্ব পর্যন্ত রমণীবাবুর ঘরে সতীর মুখোশ পরে ছিলো এক গণিকা। শরৎচন্দ্র এযাবৎ যৌনতাকে ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন, শেষের পরিচয়ে তিনি প্রথম যৌনতাকে দেখলেন ভালোবাসার সঙ্গে বিযুক্ত করে। সেদিক থেকে এখানে এক নতুন পদক্ষেপ আছে।

শেষের পরিচয় উপন্যাসে সবিতার শুধু রমণীবাবুর সঙ্গে যৌন-সম্পর্কে ছিলো না, তার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো বিমলবাবুর সঙ্গে, শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিলো ব্রজবাবুর সঙ্গে। একই নারীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই তিনটি দিকই যে থাকতে পারে এটাও বোধ হয় শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন। একই নারীসত্তার বিভিন্নমুখী প্রবণতার এমন চিত্র বাংলা সাহিত্যে অভিনব, সন্দেহ নেই। এ নিয়ে সবিতার জীবনে যে জটিলতা তার সমাধান লেখক কেমন করতেন জানি না, কারণ মাত্র ১৮পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে যাওয়ায় লেখকের পরিকল্পিত সবিতার শেষের পরিচয়টি জানতে পারি নি। কিন্তু যেটুকু লিখে গিয়েছেন, তা থেকে সবিতার যৌনজীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব প্রতিকূল ছিলো বলে মনে হয় না। তিনি সত্যকে খোলা চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন। তবে এ-প্রসঙ্গে সবিতার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার?…গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে নিশ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথাপি প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতিকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী তো কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর?'

এগারো

একদা 'নারীর মূল্যে' শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'শতকরা সত্তর জন হতভাগিনী (কুলত্যাগিনী) অন্নবস্ত্রের অভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, উপেক্ষা, উৎপীড়নেই গৃহত্যাগ করে, কামের পীড়নে করে না।' যে মনোভাব নিয়ে তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে নারীর ওপর পুরুষের অত্যাচারের প্রসঙ্গটাই বড়ো ছিলো। তাই পুরুষের উপেক্ষা ও অত্যাচারের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, নারীর জীবনে কামের দাপটের ওপর তিনি জোর দেন নি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে দেখি, সেই উপেক্ষিত দিকটি তিনি এড়িয়ে যান নি। বরং সাহসের সঙ্গে তিনি নারী-পুরুষের মূল সম্বন্ধটার মুখোমুখি হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার্য যে, যৌনতার বিষয়টাকে তিনি কল্লোলের কালের মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাবার অত্যুৎসাহ থেকে বরাবর বিরত থেকেছেন। যৌনতাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিলো না। তিনি এ-বিষয়ে ছিলেন বেশ সচেতন ও সতর্ক। তবু তাঁর উপন্যাসে যে কয়টি যৌনচিত্র আছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি সৃষ্টির আদিশক্তিকে বেশ স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। আর সেখানেই শরৎসাহিত্যের অন্যতম আধুনিকতা। এযুগের বুকে দাঁড়িয়ে আমরা এখানে স্মরণ করছি শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত উক্তি—'সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ-জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার বলে মনে করি।'[৮]

৮. স্বরাজ সাধনায় নারী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাপবোধ

এক

সকল দেশেরই ধর্মশাস্ত্রে এমন কতকগুলি কথা থাকে যা দেশকালনিরপেক্ষ। সেই শাশ্বত সর্বজনীন ধর্মনীতি অনুসারে ঈশ্বর রাজা ও বিশ্বভুবন তাঁরই রাজত্ব। ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করা এবং তাঁরই পদে আশ্রয় নেওয়া মানুষের চরম লক্ষ্য। 'ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম।'[১] এই চিরকালের ধর্ম থেকে ভ্রষ্টতার নাম পাপ এবং সেই পাপের ফল অনন্ত নরক। শরৎচন্দ্র আস্তিক হলেও তাঁর কোনো আধ্যাত্মিক আকূতি ছিলো না, ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা ছিলো না, ধর্মগত কৌতূহল ছিলো না।[২] শ্রীকান্তরূপে কমললতাকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন তার কারণ কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস নয়— যে বিশ্ববিধানকে সকলেরই মানতে হয়, সেই বিশ্ববিধানের ওপর নির্ভরতা। তাছাড়া মুরারিপুরের আখড়ায় তার মুখে শুনতে পাই—'যদিচ ধর্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধিসন্ধি আমি কোনকালে খুঁজিয়া পাইব না।' ফলতঃ শাশ্বত ধর্মনীতির বিচ্যুতি থেকে যে পাপ সেই পাপের কোনো উল্লেখযোগ্য চিত্র শরৎ-সাহিত্যে নেই।

কিন্তু শাশ্বত ধর্মনীতি ছাড়াও এক দেশজাতিধর্মনির্বিশেষ সমাজনীতি আছে যা সকলেরই মেনে চলতে হয়। কালে কালে দেশে দেশে তার রদবদল হলেও সামাজিক মানুষের জীবনচর্যার নৈতিক আদলটা মোটামুটি এক। শরৎচন্দ্র তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছেন—'মড়া মরিলে সবদেশেই প্রতিবেশীরা সৎকার করিতে জড় হয়; বিবাহে সর্বত্রই আনন্দ করিতে আসে; বাপ-মা সবদেশেই সন্তানের পূজ্য; বয়োবৃদ্ধের সম্মাননা সব দেশেরই নিয়ম; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সর্বত্রই প্রায় একরূপ; আতিথ্য সর্বদেশেই গৃহস্থের ধর্ম।...মৃতদেহের সৎকার করিতে হয়, বিবাহ করিয়া সন্তান প্রতিপালিন করিতে হয়, প্রতিবেশীকে সুবিধা পাইলেই খুন

১. ধর্ম ও সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ [দ্বিতীয় ভাগ]।

২. 'আনফরচুনেট্‌লি আমার মর্ম উল্টো দিকে গেছে, ধর্ম সাধনায় আর মনে বল পাই না।'— চন্দননগরে এক সাহিত্য-সম্মেলনে (২১.১০.৩১) শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা।

করিতে নাই, চুরি করা পাপ, এই সব স্থূল, অথচ অত্যাবশ্যক সামাজিক ধর্ম সবাই মানিতে বাধ্য ; তা তাহার বাড়ি আফ্রিকার সাহারাতেই হউক, আর এশিয়ার সাইবিরিয়াতেই হউক।'[৩] তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, এই সব সর্বজনীন সমাজনীতিকে দেশে দেশে বহন করে চলে কতকগুলি কর্মসমষ্টি যার অন্য নাম দেশাচার। সর্বজনীন সমাজনীতির বাহক এই দেশাচারগুলিকে তিনি ছোট বা তুচ্ছ বলেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এই সমাজনীতি ও দেশাচারগুলিকে বিচার করে তার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা যায়, কিন্তু নিজের ন্যায্য দাবির অছিলায় বিপ্লব সৃষ্টি করে তাদের অতিক্রম করা যায় না। সে যাই হোক, সমাজনীতি ও দেশাচারের ভ্রষ্টতা ও তজ্জনিত পাপের চিত্র শরৎ-সাহিত্যে অনেক আছে।

ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও দেশাচারের শাসন ছাড়া মানুষের জীবনে রাষ্ট্রশাসনও আছে। যে ব্যক্তি যে-দেশের মানুষ তাকে সে-দেশের রাষ্ট্রবিধি বা আইন মেনে চলতে হয়। সাধারণতঃ রাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর করে আইন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি ও দেশাচারকে মানতে বাধ্য করাও রাষ্ট্রীয় আইনের অন্যতম কাজ। তবে সব সমাজনীতি ও দেশাচারই যে দেশের আইনে প্রতিফলিত হয়, এমন নয়। চুরি করা— সমাজনীতি ও আইন উভয়ের চোখেই গর্হিত কাজ, অতএব দণ্ডনীয়। এক্ষেত্রে সমাজনীতি ও আইন একাকার। কিন্তু বারবনিতার গৃহে যাওয়া সমাজনীতির মাপকাঠিতে অপরাধ হলেও আইনের মাপকাঠিতে অপরাধ নয়। এ-ব্যাপারে আইনের হাত এড়ানো গেলেও সামাজিক দণ্ডনীতি এড়ানো যায় না। তবে উভয়ের এই প্রভেদ সত্ত্বেও সমাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে আইনের মর্যাদাও স্বীকার করতে হয়। যেখানে আইন লঙ্ঘনের চেষ্টা আছে, সেখানে বিধিগত অপরাধ বা পাপের উৎপত্তিও আছে। শরৎ-সাহিত্যে শুধু সমাজনীতি ও দেশাচার থেকে ভ্রষ্টতার পাপ নয়, দেশের আইন লঙ্ঘনের অপরাধও কম-বেশি বিবৃত হয়েছে। কিন্তু সমাজনীতি ও আইনের পরিবর্তন হয় বলে তজ্জনিত পাপ বা অপরাধ সর্বকালের সত্য নয়।

বিধবা কমললতা সন্তানসম্ভবা হয়েছিলো বলে একটা পাপবোধ তার ছিলো। গর্ভপাতের কথা তো সে চিন্তাই করতে পারে নি। কিন্তু আজকের দিনে যখন গর্ভপাত আইনসঙ্গত, তখন বিধবার সন্তান-সম্ভাবনায় অন্ততঃ বিধিগত অপরাধের প্রশ্ন ওঠে না। শরৎচন্দ্রের পাপ-চেতনা বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে এই প্রাথমিক কথাগুলি মনে রাখা দরকার।

---

৩. সমাজধর্মের মূল', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ-সাহিত্য-সম্ভার, সপ্তম সম্ভার।

দুই

শরৎ-সাহিত্যে পাপ ও পাপীর এত চিত্র কেমন করে এলো, প্রথমেই এ-প্রশ্নের একটা মীমাংসা করে নেওয়া প্রয়োজন। বঙ্কিমের উপন্যাসের মানুষগুলি অভিজাত শ্রেণীর, তারা কুলকৌলীন্যে ও অর্থকৌলীন্যে সম্রান্ত। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনমণ্ডল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের জগৎ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, বঙ্কিমের উপন্যাসের কারবার যে রাজারাজড়াদের নিয়ে তারা বাস্তবে থাকা দূরে থাকুক আমাদের কল্পনার মধ্যেও ছিলো না। তাই তাঁর উপন্যাসে বড়ো ঘরের কিছু কেলেঙ্কারির কথা থাকলেও পাপের বিস্তৃত চিত্র নেই। রবীন্দ্রনাথে এসে বাংলা উপন্যাস পুরোপুরি বাস্তবভূমির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁর উপন্যাসে যে মানুষগুলির আনাগোনা তারা আমাদের পরিবেশেই লালিত ও বর্ধিত। কিন্তু মানুষ ও লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বররুচি, তাই তাঁর কাহিনীর মানুষগুলির বাইরের ও ভেতরের চেহারায় একটা মার্জিত বুদ্ধি ও বিদগ্ধ রুচির ছাপ। তারা চেনামহলের লোক হলেও উন্নত সংস্কৃতির ছাড়পত্র নিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে এসেছে। তাই পাপের চিত্র সেখানে তেমন প্রবেশ করতে পারে নি।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নীচুতলার মানুষ। তিনি নিম্নবিত্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান। তাঁর জীবন কেটেছে ভবঘুরের মতো, সামাজিক স্থিতির দৌলতে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ তাঁর তেমন হয় নি। তাছাড়া তাঁর এক সময়ের জীবনযাত্রার প্রণালীও ছিলো অন্য ধরনের। অস্বীকার করার উপায় নেই, তিনি যৌবনে যাপন করেছিলেন একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবন। দেবানন্দপুরের গ্রাম্য পরিবেশে, ভাগলপুরের গঙ্গার কিনারায় ও রেঙ্গুনের মিস্ত্রিপাড়ায় তিনি তাদের সঙ্গেই মিশতে ভালোবাসতেন যারা ডানপিটে, ভবঘুরে, নেশাখোর, মাতাল, পতিতা ও অসামাজিক মানুষ। অবশ্য সুস্থ সামাজিক মানুষও যে দেখেন নি, এমন নয়। তবে শরৎচন্দ্র তাদেরই জীবনভর চিনতে চেয়েছেন যারা সামাজিক অর্থে ঠিক মসৃণ জীবনের শরিক নয়। ফলে তাঁর সাহিত্যে সমাজের নীচুতলার মানুষের এমন অপ্রতিহত আধিপত্য এবং তারা তাদের জীবনের স্থূলতাও কদর্যতা, ক্লেদ ও কালি, পাপ ও অপরাধ নিয়ে আমাদের সামনে অবিচলভাবে বিরাজিত। দেহ ও মনের দিক থেকে সংকুচিত ও মার্জিত না হওয়াই তাদের কপালের বাস্তব লিখন। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, এই ধরনের নীচুতলার মানুষের কথাতেই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

নিহিত। তিনি একদা বলেছিলেন—'পূর্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'[৪] এই সব কথা মনে রাখলে শরৎ-সাহিত্যে কেন পাপ ও পাপীর চিত্রের প্রাচুর্য তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমাজের নীচুতলার কাহিনী বলতে চেয়েছেন বলেই বেশ্যালয়, কুলিবস্তি, শুঁড়িখানা, মিস্ত্রিপাড়া ইত্যাদির কথা এসেছে এবং তার সঙ্গে জড়িত নষ্ট নরনারীর চরিত্রচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বেশ্যালয়ের চন্দ্রমুখী ও বিজলী, দাসীপাড়ার সাবিত্রী ও মোক্ষদা, ওয়ার্কমেন লাইনের মানিক-যদুর দল, হাফ-গেরস্ত কামিনী বাড়িউলি আমাদের সে-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিন

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাপ ও পাপীর চরিত্র বুঝতে হলে মানুষ সম্বন্ধে লেখকের মৌল দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। একথা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আধুনিক অর্থে জীবনবোধ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জাগতে শুরু করে। কিন্তু নবজাগরণের সেই উষালগ্নে ঠিকমতো মানুষকে চেনা ও জীবনকে বোঝা সহজসাধ্য ছিলো না। তার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতও তখন সৃষ্টি হয় নি। তাই বঙ্কিমের সাহিত্যে মানুষ ও জীবনের রূপরেখা-অঙ্কনে মোটা দাগের প্রয়োগই দেখা যায়। ফলতঃ এযুগের পাঠকের চোখে তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলি অতি-সরলীকরণের দোষগুণ নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা হয় ভালো, নয় মন্দ; হয় সৎ, নয় অসৎ। মানুষকে ভালোমন্দের কোনো একটায় টেনে এনে পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যেখানে তার সজ্ঞান প্রয়াস নেই, সেখানেও পাপপুণ্য ভালোমন্দের মিলিত ফলশ্রুতি বাস্তব জীবনায়নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

---

৪. ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি হিসবে শরৎচন্দ্র-প্রদত্ত অভিভাষণ।

রবীন্দ্রনাথের যুগে জীবন আরও এগিয়েছে, জটিলতর হয়েছে। তাই সংবেদনশীল লেখকের মনেও জীবনবোধ হয়েছে গভীরতর। রবীন্দ্রনাথ হাতের কাছে পেয়েছেন মনস্তত্ত্বের দীপশিখা, তার সাহায্যে জীবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠকে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন চোখের বালির মতো উপন্যাসে। কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসে মানুষের ব্যাপকতর ও গভীরতর উপলব্ধি সত্বেও তাকে পুরোপুরি ভালোমন্দের পাপপুণ্যের বাস্তব ও জীবন্ত মূর্তি হিসেবে দেখার প্রয়াস নেই। তিনি অবশ্য ভালোর সঙ্গে মন্দকে, পুণ্যের সঙ্গে পাপকে কখনও কখনও গ্রহণ করেছেন— কিন্তু তার পেছনে বাস্তববোধের চেয়ে আদর্শগত বিশ্বাসই কাজ করেছে বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের অমৃতসত্তায় এবং জীবনের মহৎ লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁর সেই অমৃতসন্ধানী সাংঘটিক (synthetic) দৃষ্টির মধ্যে ভালো মন্দ সব একাকার হয়ে যেতো। আর সেই আদর্শগত মনোভাবের প্রবর্তনা বশতঃ তিনি লিখেছেন— '…পাপ বলিয়া যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে। পাপীর যে ধার্মিকের চেয়ে বেশি আছে তাহা নহে, ধার্মিকের যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্যন্ত। পাপীর ধর্মবুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে, কেবল পাপ থাকিবে না—যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পন-প্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতন্যের প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণ্যে পরিণত হইতে থাকিবে।'[৫] যিনি সত্যের ব্যাপারে কোনো রকমের আপোস করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যিনি কখনও মিথ্যাচারকে স্বীকার করতে চান নি তাঁর কণ্ঠে স্বাভাবিকভাবেই ধ্বনিত হয়েছে ঋষির প্রার্থনা : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।[৬]

এতো গেলো চরম আদর্শের কথা। লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এইটুকু স্বীকার করেছেন যে,—'পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস বলেই জানি। চরিত্রকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কৃতকার্য হলেই আমাদের মনে আর কোনো সংকোচ থাকে না ; আমরা মনে করি চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমাদের দ্বারা সিদ্ধ হল।'[৭] লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পাপের বিনাশ সম্পর্কে অবিচল থেকে লৌকিক জীবনে ভদ্রতা রক্ষার জন্য যে

৫. পাপপুণ্য, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬. পাপের মার্জনা, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭. পাপ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভালোমন্দ পাপপুণ্যের আপোস-রফা চলে সেটুকু মাত্র তিনি মেনে নিয়েছেন। এতেও কিন্তু পাপ ও মন্দকে বাস্তব জীবনের সত্য হিসেবে স্বীকারের চেষ্টা নেই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রে এসে মানুষ ও জীবন, ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা শরৎচন্দ্রের স্বোপার্জিত, কতকটা আধুনিক কালের কাছ থেকে আহৃত। আধুনিক কালে আমাদের চোখে মানুষ শুধুই দেবতা নয়, আবার শুধুই দানব নয়। মানুষের মধ্যে আমরা এখন দেখতে পেয়েছি সুরাসুর দুই-ই। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পথে চলতে চলতে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে আরও অনেক জিনিসের অঙ্গে মানববীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিরও যে বদল ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর্নল্ড টয়েন্‌বির একটি উক্তিতে— 'Human nature is, in truth, a union of opposites that are not only incongruous but are contrary and conflicting : the spiritual and physical ; the divine and the animal ; consciousness and subconsciousness ; intellectual power and moral and physical weakness ; unselfishness and self-centredness ; saintliness and sinfulness ; ···in short, greatness and wretchedness··· But the paradox does not end there. The conflicting elements in Human Nature are not only united there ; they are inseparable from one another.'[৮] মানবচরিত্রের ভালোমন্দের এই সংযুক্তি ও অবিচ্ছেদ্যতায় বাস্তব সত্য হিসেবে শরৎচন্দ্রের পুরোপুরি বিশ্বাস ছিলো। গৃহদাহে অচলা মৃণালকে প্রশ্ন করেছিলো— সতীত্ব যদি নিত্য ধর্ম হয়, তবে এত অনাচার আছে কেন? মৃণাল উত্তর দিয়েছিলো— 'ওটা থাকবে বলেই আছে। ধর্ম যখন থাকবে না, তখন ওটাও থাকবে না। বেরাল-কুকুরের ত ভাই অনাচার নেই।' অর্থাৎ পুণ্য যেমন স্বভাব, তেমনি পাপ স্বভাব—অভাব নয়। শরৎচন্দ্র যে দেবদাসকে এঁকেছেন তার মধ্যে প্রেমিক ও দুশ্চরিত্র মিলেমিশে আছে। গৃহদাহের সতীশ চরিত্রহীন— সে মদ খায়, মাতাল হয়, বন্ধুর রক্ষিতার ঘরে গিয়ে গানবাজনা করে, ঝিয়ের আঁচল ধরে টানে। সতীশের দেহ, সাবিত্রীর ভাষায়, নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, ভগবানের দেওয়া তার আত্মাটি নষ্ট হয় নি এবং

৮. An Historical Approach to Religion (1957), Arnold Toynbee, p. 287.

সেই আত্মা দিয়ে সে গভীরভাবে ভালোবেসেছে কুলটা সাবিত্রীকে। পথের দাবীর শশীকবি বেহালা বন্ধক দিয়ে বার বার মদ খায়, কিন্তু সে যখন বেহালা বাজায় তখন মানুষের সমস্ত কান্না তার মধ্যে বেজে ওঠে, যে নবতারা ভালোবাসার অভিনয় করে তাকে ঠকিয়েছে তাকেই নিজের বেঁচে থাকার সম্বল পাঁচ হাজার টাকা দান করতে দ্বিধা করে না। শরৎচন্দ্র এই ধরনের অনেক চিত্র এঁকেছেন যেখানে ভালোমন্দ পাপপুণ্য মিলেমিশে মানুষের বাস্তব স্বরূপ-সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বঙ্কিমের মতো সুমতি ও কুমতির পৃথকীকরণে কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো পুণ্যের কাছে পাপের পরাভবের তত্ত্বে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি জীবনের সত্য হিসেবেই পাপের চিত্র এঁকেছেন।

তাছাড়া আর এক দিক থেকেও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব ধরা না পড়ে পারে না। আমরা সাধারণতঃ বাইরে থেকে মানুষকে বিচার করে থাকি বরং তার ভালোমন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে বসি। কিন্তু বাইরে থেকে বিচার করলে যাকে মন্দ বলে মনে হয়, তা মন্দ নাও হতে পারে। মানুষের তো শুধু বাহ্যজীবনই নেই, তার একটা মনোজীবনও আছে। ভালোমন্দ বিচারের সময় মানুষের সেই মনোজগতের হদিস নেওয়া দরকার। সেই মনোজগতের সংবাদ নিলে দেখা যাবে, অনেক সময় মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্তের রদবদল করতে হয়। তাই তিনি মনে করতেন, বাইরে থেকে বিচার করে কারও পাপ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হওয়া উচিত নয়। অভয়া যখন স্বামী-গৃহ থেকে ফিরে এসে অবৈধভাবে রোহিণীবাবুকে গ্রহণ করলো তখন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিলো শ্রীকান্তের মনে। সে কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো অভয়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যাচ্ছিলো। কিন্তু অকস্মাৎ শ্রীকান্তের মনে হলো—'…না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই— এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়— এসব অভ্যাস মত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ— এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই;' অর্থাৎ শাস্ত্রের আলোকে মানুষের পাপ-পুণ্য বিচার করার অধিকার কারও নেই, প্রত্যক্ষভাবে জীবনকে জেনে— তাকে তলিয়ে দেখে ভালোমন্দের বিচার করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ অভয়ার ক্ষেত্রে

হয়েছিলো বলে শ্রীকান্ত শেষ পর্যন্ত রোহিণী-অভয়ার প্রতি বিরূপ থাকতে পারে নি—অভয়া যে সন্তানের জননী হবে তাকে ভাগ্যবান বলে অভিনন্দন করতেও সে এগিয়ে গেছে।

পাপ-বিচারে শরৎচন্দ্রের এই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ও অপক্ষপাত নীতির সার্থকতম প্রয়োগ হয়েছে অন্নদাদিদির ক্ষেত্রে। বাহ্যতঃ তিনি ভ্রষ্টা নারী। বিবাহিতা হয়েও এক সদ্যপরিচিত সাপুড়ের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথের সাহায্যে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও তার বিদায়-বেলার পত্র পড়ে শ্রীকান্ত বুঝতে পারলো—অন্নদাদিদি এক অসাধারণ মহীয়সী নারী, সতীধর্মের এক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যার সঙ্গে অন্নদাদিদি পালিয়েছিলেন তিনি আসলে তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পাপিষ্ঠ স্বামী। সুতরাং বাইরের লোক যাঁকে চরম অসতী বলে জানে তিনি বস্তুতঃ সতীকুলের রাণী। তাই শ্রীকান্ত বার বার সোচ্চার হয়ে অন্নদাদিদির জন্য অক্ষয় সতী-স্বর্গ নির্দিষ্ট করেছে। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে শরৎচন্দ্র বোঝাতে চাইলেন যে, বাইরে থেকে তথাকথিত পাপীর বিচার করা কতই না ভুল! সমাজনীতির বিচারে বা দেশাচারের বিধানে যারা কপালে পাপের কলঙ্ক-তিলক পরতে বাধ্য হয়, তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে অন্ততঃ কেউ কেউ অন্নদাদিদির মতো সত্যই কলঙ্কিনী নয়। তাই শ্রীকান্ত পাপিষ্ঠাদের সম্পর্কে আবেগের সঙ্গে বলেছে যে, পাপ তাদের শুধু বাহ্য আবরণ; যখন খুশি ফেলে দিয়ে অন্নদাদিদির মতোই সতীর আসনের ওপর অনায়াসে গিয়ে বসতে পারে।

চার

পাপ ও পাপীর চিত্রে শরৎচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভ্রষ্ট নরনারীর জীবনের যে মন্দের দিক, হীনতার দিক তার বর্ণনা নিশ্চয়ই তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে পাপীর ভালোর দিক সম্পর্কেও এক সহৃদয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলতঃ বিশ্বাস করতেন, পাপপ্রবণতা বা অধর্মাচরণ জীবনের একটি দিক মাত্র— পাপ ও অপরাধ একটা মানুষের চরিত্রকে অংশতঃ নষ্ট করলেও তার অন্যান্য দিক অক্ষত থাকতে পারে। মানবসত্তার সেই অক্ষত অংশের গুণাবলী শরৎচন্দ্র সচেতনভাবেই প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনি অসুরের মধ্যে সুরকে আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি— যদি তা করতেন তা হলে জীবনসত্যকে দেখার গৌরবমাত্র তাঁর প্রাপ্য হতো। তিনি আরও

এগিয়ে গিয়ে হীনতার পাশে যে মহত্ব আছে তাকে মানবিক ভাবদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করার ও হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে অভিষিক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কোনোখানে হৃদয়ের সেই পক্ষপাত রেখে-ঢেকে দেখান নি— সর্বত্রই পাপীর অন্তর্লীন ভালোত্বের সপক্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন। যে ব্যক্তি মন্দের বশীভূত হয়ে খারাপ কাজ করে ফেলেছে, তার মধ্যে খারাপ কাজের প্রবণতা বা উৎসাহ ছাড়া অন্য কোনো বড়ো সম্ভাবনা আছে কি না, তার সন্ধান শরৎচন্দ্র বেশ আগ্রহের সঙ্গে করেছেন।

দেবদাসের বাল্যপ্রেমে অভিশাপ ছিলো। তার ভালোবাসার পাত্রী পার্বতীর সঙ্গে তার মিলন হয় নি। সেই ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় সে পতিতালয়ে গেছে, মদ খেয়েছে, মাতাল হয়েছে। এর পরিণামে দেখা দিয়েছে পেটে লিভারের ব্যথা, গায়ে জ্বর, মুখে রক্তক্ষরণ। কিন্তু সেই মরণের মুখে দাঁড়িয়েও সে ভোলে নি পার্বতীকে। তাই সে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি হাতিপোতার অশ্বত্থতলায় বাঁধানো বেদীতে পেতেছে জীবনের শেষ শয্যা। দেবদাস এই করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেলো তার লাম্পট্যের বহির্বাসের অন্তরালে উজ্জ্বল হয়ে আছে এক অমর প্রেমিক-সত্তা। শরৎচন্দ্র সেটা দেখাবার জন্য দেবদাসকে হাতিপোতায় টেনে এনেই ক্ষান্ত হন নি, তার প্রেমিক-সত্তার সপক্ষে করেছেন চোখের জলের ওকালতি— 'দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ-কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত কষ্ট পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার কপালে পৌঁছে— যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।'

এই দেবদাস-প্রসঙ্গে মনে পড়ে চন্দ্রমুখীর কথা, চোদ্দ বছর বয়সে একজনকে ভালোবেসে সে গৃহত্যাগ করেছিলো। কিন্তু তার পরিণামে এখন সে বারবনিতা। তার সেই দেহব্যবসায়ে স্বাভাবিক কারণেই পাপের কোনো অন্ত নেই। কিন্তু কে জানতো এই কলঙ্কিনীর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে এক প্রেমিকা। সেই প্রেমিকা-সত্তার জাগরণ ঘটেছে দেবদাসের তীব্র ঘৃণায়। তারপর শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন চন্দ্রমুখীর পরিবর্তন। সে তার পেশা ছেড়েছে, সুখভোগ ছেড়েছে। একজন স্ত্রীলোকের কাছে যা-কিছু লোভের জিনিষ তা সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বরণ করে

নিয়েছে প্রায় দুঃখের জীবন। পাছে আবার প্রলোভনে পড়ে সেজন্য সহর থেকে চলে গেছে গ্রামে। কিন্তু দেবদাসের জন্যই তাকে আবার আসতে হয়েছে সহরে, বসাতে হয়েছে পুরনো বাসর। তারপর একদিন অসুস্থ দেবদাসের সাক্ষাৎ মেলে, তার সেবাযত্নে দেবদাস সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই সময় তাকে চন্দ্রমুখী বলেছে— 'তুমি আমার সর্বস্ব তা কি আজও বুঝতে পারো নি ?' আর দেবদাস চন্দ্রমুখীকে বলেছে— '...আমি ভালবাসি, বাসি বৈ কি।...পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা তোমার কি বিচার করবেন জানিনে ; কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনও তোমা হতে দূরে থাকতে পারব না।' অর্থাৎ চন্দ্রমুখীর পাপ বিচারের ভার বিধাতার ওপর ছেড়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন ভালোবাসার এক নির্মল আসন এবং সেই আসনে বসিয়েছেন চন্দ্রমুখীকে। ক্লিন্ন জীবনের খাদ থেকে ভালোবাসার রত্ন আবিষ্কারের এই দায়িত্ব লেখক সচেতনভাবেই গ্রহণ করেছেন।

চরিত্রহীন উপন্যাসের নায়ক সতীশের যৌন-ব্যভিচারের কোনো ইতিহাস শরৎচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেন নি, কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনযাত্রার জন্য তার কপালে পরিয়ে দিয়েছেন চরিত্রহীন নামের কলঙ্ক-তিলক। সেকালের পুরুষ মানুষের বেচাল চালচলন ও একটু-আধটু দোষ ধর্তব্যের মধ্যে ছিলো না এবং তা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কোনো গুরুতর রকমের অন্তরায়ও সৃষ্টি করতো না। তাই শরৎচন্দ্র সতীশকে আরও অধঃপাতের দিকে যেতে না দিয়ে প্রায় অনায়াসেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন সমাজের দিকে, সরোজিনীর দিকে। গলায় যার মোটা পৈতা, যে সন্ধ্যা আহ্নিক করে, মোসলমানের ছোঁয়া পাঁউরুটি খায় না, সে উচ্ছৃঙ্খল হলেও তাকে নিয়ে লেখকের বেগ পেতে হয় নি ! শুধু সরোজিনীর প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার একটা উপাখ্যান তাঁকে বানাতে হয়েছে এবং চাকর বেহারীর কাছ থেকে সতীশ-সাবিত্রীর পবিত্র সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয়েছে। এর জন্য শরৎচন্দ্রকে বাড়তি কোনো দাক্ষিণ্য প্রকাশ করতে হয় নি। কিন্তু সাবিত্রীকে যে অবস্থা থেকে যে অবস্থায় তিনি উন্নীত করেছেন তা লেখকের সহৃদয় দাক্ষিণ্য ও মানবিক সহানুভূতি ছাড়া সম্ভব ছিলো না। সাবিত্রী ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুরূপা, লেখাপড়া জানে— কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্রই তার পরিচয় নয়। সে সতীশকে নিজেই বলেছে— 'আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা।...এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পায়ে দেওয়ার যোগ্যতাও এর নেই। এই দেহ নিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভুলিয়েছি, এ ত আমি কোন মতেই

ভুলতে পারব না। এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পূজো হবে না।' সাবিত্রীর যে জীবনে বিবাহের যোগ্যতা নেই সেই জীবনকে সামাজিক মর্যাদায় না হলেও উচ্চ মানবিক মর্যাদায় শরৎচন্দ্র অধিষ্ঠিত করেছেন! তিনি তাকে বসিয়েছেন সেই উপেন্দ্রের ছোটবোনের আসনে—যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন যাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্মল করেছে। শুধু তাই নয়, লেখক উপেন্দ্রের মুখ দিয়ে আরও বলিয়েছেন—'আমার ছোট বোন সংসারে কি কোন মেয়ের চেয়ে ছোট সাবিত্রী, যে, কোথাও তার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হবে? আমার বোন, পৃথিবীতে সে কি সোজা পরিচয় দিদি?…যাও দিদি, যার বোন বলে তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে, তাকে বোলো, আমরা দু' ভাই-বোন আজ পর্যন্ত কখনো সংসারে ছোট কাজ করি নি।' এই ভ্রষ্টা সাবিত্রীর জীবনে নারীসুলভ নানা সদ্‌গুণ শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন, তারই ভিত্তিতে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন আপন মনের সমস্ত দরদ। তার ফলে সাবিত্রী উন্নীত হয়েছে মহীয়সী নারীতে।

এখানে 'আঁধারে আলো' উপন্যাসের বিজলীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সে নর্তকী, আজীবনের সহস্র অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তারও অর্ধমৃত নারী-প্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জেগে উঠেছে। যে রোগে আলো জ্বললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে, সেই রোগেই তার বাঈজী-জীবন চিরকালের জন্য মরে গেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, শরৎচন্দ্রের অযাচিত করুণার ধারায় অবগাহন করেই বিজলীর ঊর্ধ্বায়ন।

এইতো গেলো পতিত নরনারীর অন্তর্জীবনে পাপের পাশে সদ্‌গুণ সন্ধানের কথা। ভিন্নতর চিত্রেও লেখকের এই জাতীয় মানবিক সহানুভূতির অসদ্ভাব হয় নি। পথের দাবীতে ভারতী একদিন অপূর্বকে নিয়ে প্রবেশ করেছে সেই ওয়ার্কমেন লাইনে যার অন্য নাম জীবন্ত নরককুণ্ড। ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিয়ে সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিলো, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলছে। এখানে মেয়েরা প্রকাশ্যে ছেঁড়া চট সরিয়ে পায়খানায় ঢোকে, দশ-এগারো বছরের মেয়ে বাপের জন্য মদ কিনে আনে ও মায়ের পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে ঘর ভাড়া করার কথা বেহায়ার মতো বলে যায়। ঘরে ঘরে চলে স্ত্রী-পুরুষের অবিরাম মদ খাওয়ার পালা। যৌন অনাচারের তো শেষই নেই। জীবনযাত্রায়, আচরণ-বিধিতে, কথাবার্তায় কোথাও নেই ভদ্রতার পালিশ। এদের এই সব অনৈতিক জীবনযাত্রা দেখে অপূর্ব শিউরে ওঠে এবং অবিলম্বে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু

সেই সময় শরৎচন্দ্র ভারতীর মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বলিয়েছেন, তাতে আছে তাঁর অপার সহানুভূতির প্রকাশ—'মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করছে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেছেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন ?…ওই মেয়েটার মা এবং যদু যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে ? …আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে।' আর কুলিবস্তির পাপিষ্ঠ মানুষ-গুলির প্রতি ভারতীর মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের আবেদন—'তোমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তোমরা সমস্ত পাবে।' অর্থাৎ ব্যক্তির পাপের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমষ্টির পাপের ক্ষেত্রে মানুষের ভেতরকার মহৎ সম্ভাবনায় শরৎচন্দ্র প্রত্যয় স্থাপন করেছেন। যদিও এদের অন্তর্লীন ভালোকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত তিনি করেন নি, কারণ সেটা উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো না—তবু শরৎচন্দ্রের মানবিক সহানুভূতি মিস্ত্রিপাড়ার পাপী মানুষ-গুলির প্রতি নিঃশেষেই নিবেদিত হয়েছে।

পাপ ও পাপীর প্রতি নিজের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র অবহিত ছিলেন। তিনি একাজ জ্ঞাতসারেই করেছেন, অজ্ঞাতসারে করেন নি। কেন করলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের এক সাহিত্যসভায় (১৯২৩) তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'আমি পাপীর চিত্র এঁকেছি। হয়তো পাপ তাঁরা করেছেন, তাই বলে খুনী আসামীর মতো তাঁদের ফাঁসি দিতে হবে নাকি ? মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনও পারি না। কোনো মানুষকে নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারি না যে, একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই। ভাল মন্দ দুই সবার মধ্যে আছে, তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করব ? আমি অবশ্য কখনও বলি না যে পাপ ভালো। পাপের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই না। আমি বলি তাদের মধ্যেও তো ভগবানের দেওয়া মানুষের আত্মা রয়েছে। তাকে অপমান করবার আমাদের কোন অধিকার নেই। আমি এমন অনেক জিনিষ অনেক সময় তাদের মধ্যে পেয়েছি, যা বড় সমাজের মধ্যে নেই।… আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে যা ভালো দেখাতে চেয়েছি ; কারণ তাকে discard করবার আমাদের right নেই। যেখানে বড় জিনিষ আছে, তাকে সম্মান করতে হবে।'

পাঁচ

পাপী চরিত্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোটা মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা যায়। তিনি মানুষের মধ্যে একহারা চারিত্র্যই দেখেন নি, দেখেছেন বিচিত্র জটিল চারিত্র্য। যে দেবদাস মদ খেয়ে মাতাল হয় এবং বেশ্যালয়ে দিনযাপন করে তার মধ্যে থাকতে পারে এক প্রেমিক মানুষ; যে হরিলক্ষ্মী আত্মকেন্দ্রিক অহংকারে অপরের অহেতুক সর্বনাশ করে তারও ভেতর থেকে জেগে উঠতে পারে এক হৃদয়বতী নারী। অস্বীকার করার উপায় নেই, মানবচরিত্রের এই জটিলতা ও বিচিত্রতা যিনি দেখেছেন, তিনি মানব-বীক্ষণে আধুনিক কালের সমীপবর্তী। কিন্তু পাপী মানুষ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শরৎচন্দ্র সমকালে ও পরবর্তী কালে কিছু তিরস্কৃতও হয়েছেন। যদি পাপের পাশে প্রেম ফুটে ওঠে, তবে পাপের ভয়ঙ্করত্ব হ্রাস পায় এবং তার সম্পর্কে সামাজিকরা স্বাভাবিকভাবেই অসাবধান হয়ে পড়ে। চেহারায় যে পাপ কদর্য এবং স্বভাবে খল ও ক্রূর, প্রেমের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় সেই পাপ যদি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে সামাজিক মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং একজন সাহিত্যিকেরও যে সামাজিক কর্তব্য থাকে, সেই কর্তব্যের অনুরোধেই পাপকে আচ্ছন্ন ও লঘু করে ফেলা শরৎচন্দ্রের পক্ষে উচিত ছিলো না, একথা কেউ কেউ মনে করেন। তাছাড়া সাহিত্যের দিক থেকেও এটা সঙ্গত হয় নি বলে কারও কারও ধারণা। কারণ সত্যকে সত্য হিসেবে দেখাই সাহিত্যিকের কর্তব্য, একথা যদি ধরে নিই, তবে পাপকেও তার সমস্ত কদর্যতা ও খলতা নিয়ে পাপ হিসেবে দেখাই উচিত। তাতে পাপীর যদি ফাঁসি হয়, দণ্ডনীতির প্রয়োগে তার যদি কঠিন শাস্তি হয় তবু সাহিত্যিকের ভাববার কিছু নেই। সাহিত্যের ন্যায়শাস্ত্রের এটাই বিধান।

শরৎ-সাহিত্যে পাপ ও পাপীর চরিত্র সম্পর্কে এই দ্বিমুখী অভিযোগের বিচার হওয়া দরকার। একথা পুরোপুরি সত্য নয় যে, পাপকে পাপের দিক থেকে তিনি একেবারেই দেখেন নি। প্রেসিডেন্সী কলেজের বক্তৃতায় (১৯২৩) তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তিনি পাপকে ভালো বলেন না এবং তার প্রতি কাউকে প্রলুব্ধ করতেও চান না। অন্যত্রও বলেছেন, তিনি মন্দকে মন্দই বলেন। সাবিত্রীদের দাসীপাড়ায় গিয়ে বিপিনবাবুর উচ্ছৃঙ্খলতা ও তার পয়সায় মদ খেয়ে মোক্ষদাদের অশালীন মাতলামির রোমহর্ষক চিত্র তিনি চরিত্রহীনে অঙ্কন করেছেন। তার কুশ্রীতা ও কদর্যতার চেহারাটি পাঠকের মনে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা

জাগিয়ে তোলে। শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্বে আমরা সাক্ষাৎ পাই কুশারী মশায়ের ভ্রাতৃজায়া সুনন্দার। পরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করার মধ্যে যে পাপ, তার বিরুদ্ধে সর্বশুচি আগুনের মতো দাঁড়িয়েছিলো এই নারী। সে পাপের সঙ্গে ঘর করতে নারাজ, এমন কি সামান্য রকম আপোষ-রফা করতেও সে প্রস্তুত নয়। তার ফলে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়েছে, এমন কি অনাহারে মরার সম্ভাবনাও তাকে মেনে নিতে হয়েছে। তবু সে মচ্‌কায় নি। কারণ সকলের চেয়ে বড়ো যে ধর্ম, সেই ধর্মের জন্য সব কিছু হারাতেও সে প্রস্তুত ছিলো। পুণ্য ও ধর্মের কঠোর ও কঠিন মূর্তি সুনন্দা সম্পর্কে তার স্বামী যদু তর্কালঙ্কারের উক্তি এখানে স্মরণ করতে পারি—'আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটি কথাও অন্যায় বলে নি। শ্বশুর মশায় সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্মকে যদি সত্যি চাও, তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কথ্‌খনো ভুল করে নি।'

পথের দাবীর নবতারার স্বামীত্যাগ ও পুনর্বিবাহের ঘটনায় অন্যান্য চরিত্রের যে প্রতিক্রিয়া তা এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। সুমিত্রা নবতারার স্বামীত্যাগ সমর্থন করতে ইতস্ততঃ করে নি, কারণ যে স্বামীকে সে ভালোবাসতে পারে নি, পথের দাবীর মতো একটা বড়ো কাজের জন্য তাকে ত্যাগ করাটা তার মতে অন্যায় নয়। কিন্তু অপূর্ব প্রতিবাদ করে বলেছে, এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত হবার ভয় থাকবে না? এই সকল শিক্ষায় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে অশান্তি ও বিপ্লব এসে উপস্থিত হবে না? সে ভয়ানক রকমের হিন্দু বলে তার এই প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত। কিন্তু সব্যসাচীও প্রকাশ্যে নবতারার সমর্থন থেকে বিরত থেকেছেন, মেয়েদের মান-অভিমানের ব্যাপারটা ভালো বোঝেন না বলে এড়িয়ে গেছেন। ভারতীও বোধ করি তেমন প্রসন্ন ছিলো না, তাই বিয়ের আগেই শশীকবি তার বাড়ির নাম 'শশী-তারা লজ' রাখায় সে সব্যসাচীকে বলেছিলো—'এ ভারি অন্যায়। এ সব তুমি প্রশ্রয় দাও কি করে?…এ সব নোঙরা কাণ্ড তুমি বারণ করে দাও। নইলে আমি ওঁর ঘরে যাব না।' তারপর শশী-তারার বিবাহ প্রসঙ্গে সব্যসাচীর মুখে শুনতে পাই—'শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংস্কারে বাধে, হয়ত বা দেশের আইনে বাধে।…আমার একমাত্র ক্ষোভ শশী আর কাউকে যদি ভাল-বাসত ভারতী।' নবতারা সম্পর্কে সব্যসাচীর এই বিরূপতার যাথার্থ্য শেষ পর্যন্ত নিরূপিত হয়ে যায়—শশীর টাকা নিয়ে তার আহমেদ নামক অন্য এক

ব্যক্তিকে বিয়ে করার ঘটনায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নবতারার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র অন্যায় ও অপরাধকে প্রশ্রয় দেন নি, তার হীনতা উদ্‌ঘাটিত করারই ব্যবস্থা করেছেন।

শরৎচন্দ্র সোচ্চার হয়েছেন অন্নদাদিদির সতীকাহিনী বর্ণনায়। কিন্তু তিনি কঠোর মনোভাব নিয়েছেন তাঁর স্বামী শাহ্‌জীর কথায়। যে স্বামীর জন্য অন্নদাদিদি গৃহত্যাগ করেছেন তার পাপ সম্পর্কে দিদির মনে কোনো সংশয় ছিলো না। তিনি নিজেই বলেছেন—'এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না।' শাহ্‌জীর যে চরিত কাহিনী শ্রীকান্তে আছে তাতে তাকে পাষণ্ড, লম্পট, হত্যাকারী ও জোচ্চোর বলে স্পষ্টই মনে হয়। তার শাস্তিও সে পেয়েছে। তাকে ধর্মত্যাগ করতে হয়েছে, ছদ্মবেশে লোক সমাজ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে, অপঘাতে মৃত্যুর পরোয়ানা স্বহস্তে গ্রহণ করতে হয়েছে। এখানে শরৎচন্দ্র পাপের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন। এর সঙ্গে বলা যেতে পারে কমললতার সর্বনাশের নায়ক মন্মথর কথা। কমললতা একদা একে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলো এবং বিধবা অবস্থাতেই সন্তানসম্ভবা হয়েছিলো। কিন্তু মন্মথ আসলে ছিলো প্রণয়ীর বেশে এক পাষণ্ড। সে শুধু কমললতার সর্বনাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই অস্বীকার করে নি, সে কমললতাকে বৈষ্ণব মতে বিয়ে করার শুল্ক হিসেবে বিশ হাজার টাকা দাবি করে। শরৎচন্দ্র এখানে প্রত্যক্ষতঃ ব্যভিচারী মন্মথকে কোনো শাস্তি দেন নি বটে, কিন্তু সমস্ত কাহিনী বর্ণনায় তাকে ঘৃণ্য করে তুলতে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছেন। তার পাপবুদ্ধি ও পাপাচরণ যে লেখকের ক্ষমা পায় নি, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। তা না হলে কমললতা বলতো না, মন্মথ হচ্ছে তার ইহকালের পরকালের নরকযন্ত্রণা।

ছয়

কমললতার প্রসঙ্গটি শরৎচন্দ্রের আর একটি বক্তব্যও আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ভালোবাসার খেলা খেলে মন্মথ এই বিধবা মেয়েটির যে চরম সর্বনাশ

করেছিলো, তার দায়িত্ব সে অবলীলাক্রমে চাপিয়ে দেয় নিজের ভাইপো যতীনের ওপর। অথচ যতীন ছিলো জ্ঞানতঃ ও ধর্মতঃ নিরপরাধ। এক মহাপাষণ্ডের কাণ্ডজ্ঞানহীন মিথ্যা ভাষণ সংসারে এক নির্দোষ মানুষের কত ক্ষতি করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যতীনের আত্মহত্যায়। এ এক পরম বেদনাদায়ক ঘটনা। এমনিতর ভয়ঙ্কর ঘটনা সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায়, একজনের পাপের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয় আর একজন। পাপ মুখ্যতঃ ছিলো মন্মথর, গৌণতঃ কমললতার। কিন্তু শাস্তি পেলো যতীন। এ-ঘটনার উল্লেখ করে কমললতা গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছে—'পাপ জিনিসটা সংসারে এত ভয়ঙ্কর কেন জানো ?···এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু তাই দিয়ে দিদির অপরাধের প্রায়চিত্ত করে গেল।···এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে ?' কেন এমন হবে, তারই সঙ্গত প্রশ্ন কমললতার মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র এখানে তুলেছেন।

বিরাজ-বৌর মর্মান্তিক পরিণামের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অসামান্য সুন্দরী গৃহস্থবধূর ওপর লালসার দৃষ্টি পড়েছিলো জমিদারনন্দন রাজেন্দ্র-কুমারের। কিন্তু আপন সুদৃঢ় স্বামী-সংস্কারের বশে এবং চারিত্রিক বলে সেই লালসার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেছে বিরাজ-বৌ। তবু এক চরম দারিদ্র্যের কালে তিন দিন অনাহারে থাকার সময়ে স্বামীর অমানুষিক ব্যবহারের ফলে সে মুহূর্তের ভ্রমে রাজেন্দ্রকুমারের বজরায় গিয়ে উঠে বসে। কিন্তু বজরার ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে তার মনে হয়, এ হচ্ছে পাপের গুহা। সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ-বৌ লাফিয়ে পড়ে জলে। তারপর পথে পথে চলতে থাকে তার ভিখারিণীর জীবন। অনাহারে ও রোগে মরণদশা এসে উপস্থিত হয়। মৃত্যুর আগে সে স্বামীর কাছে ফিরে আসে বটে, কিন্তু আপন কাণ্ডজ্ঞানহীন অন্যায় কাজের দুর্নাম ও শাস্তি মাথা পেতে নেয়। সুতরাং একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র বিরাজ-বৌর পাপ যত ছোটোই হোক তার শাস্তির পুরোপুরি ব্যবস্থাই করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো পাপ যার সেই রাজেন্দ্রকুমার অক্ষতই রয়ে গেলো। সংসারে দেখা যায়, সমাজের দণ্ডনীতির সুকঠোর প্রয়োগ হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে—কিন্তু পাপিষ্ঠ পুরুষরা অদণ্ডিতই থেকে যায়। এই অবিচারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপন্যাসের এক নারীচরিত্রের মাধ্যমে—'যারা আসল পাপী তাদের কিছু হ'ল না, আর আমাদেরই তিনি এমনিই করে শাস্তি দিচ্ছেন!'

সাত

শরৎচন্দ্র পাপ সম্পর্কে অবহিত ও স্থানে স্থানে কঠোর থেকেও কখনও কখনও তাকে এড়িয়ে গেছেন। ব্যক্তির অপরাধ যেখানে শাস্তির যোগ্য সেখানে তাকে উপেক্ষা করা সমাজনীতি ও রাষ্ট্রবিধি উভয় দিক থেকেই অন্যায়। এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে অভয়ার স্বামীর প্রসঙ্গ। লোকটিকে কাঠচুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে সাহেব-ম্যানেজার সস্‌পেণ্ড করে। তদন্তের ভার পরে হেড অফিসের শ্রীকান্তের ওপর। এর আগেও বর্মা রেলওয়ে থেকে ওর চাকুরি চলে গিয়েছিলো কোনো গুরুতর অপরাধে। শ্রীকান্ত লোকটির কথা শুনে বুঝতে পারে, সে অপরাধী। অভয়ার প্রতি এর অমানুষিক অবিচারের কথাও শ্রীকান্তের মনে পড়ে। ফলে প্রথম দর্শনের পরেই অভয়ার স্বামী সম্বন্ধে প্রচণ্ড ঘৃণায় তার শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অভয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শর্তে শ্রীকান্ত তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। অভয়ার জন্যই এই মহাপাপিষ্ঠকে বেকসুর খালাস দেওয়া মানবিক দিক থেকে যতই মহৎ কাজ হোক না কেন, বাস্তব সংসারের দিক থেকে অনুচিত কর্ম। সমাজনীতি ও আইন উভয় দিক থেকেই চুরি একটা অপরাধ। সেই অপরাধের শাস্তি অবশ্যই অভয়ার স্বামীর প্রাপ্য ছিলো! প্রশ্ন উঠতে পারে, অভয়ার পুনর্বাসনের মতো বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তার স্বামীর চুরি করার ক্ষুদ্রতর অপরাধ মেনে নেওয়া অবাস্তব নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, স্বামীর সংসারে অভয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে রোহিণীবাবুর সঙ্গে একত্র বাস করতে শুরু করেছে এবং যৌন স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে লোকটিও অভয়াকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে সংসারে আগের মতোই নিশ্চিন্তে আরও অপরাধ করার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং শ্রীকান্তের মহৎ মানবিক উদ্দেশ্য একটুও সফল হয় নি। বরং পাপের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। এইভাবে বিচার করলে মনে হয়, শরৎচন্দ্র এখানে পাপ সম্পর্কে সতর্ক না থেকে একটা শিথিল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ করা যেতে পারে পথের দাবীর অপূর্বর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। অপূর্ব স্বভাবতোভাবেই দুর্বল মানুষ। তবু ভারতীর আকর্ষণে ও দেশের প্রতি মমতা থাকায় সে পথের দাবীর মতো একটি সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়। তার উদ্দেশ্যের সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পরীক্ষা না করেই যে তাকে পথের দাবীতে গ্রহণ করা হয়েছিলো, তার অবশ্য প্রশংসা করা যায় না। তবু কোনো প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকলে তার নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, অপরাধের

ক্ষেত্রে শাস্তিও মাথা পেতে নিতে হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অলিখিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিলো খুব কঠোর ও কঠিন। সেখানে সামান্য শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্যও গুরুতর শাস্তি দেওয়া হতো। সেই হিসেবে পুলিশ কমিশনারের কাছে পথের দাবীর গোপন সংবাদ প্রকাশ করে দেওয়া অপূর্বর এক জঘন্যতম অপরাধ। এর ফলে সকলেরই সর্বনাশের আশু সম্ভাবনা ছিলো, সব্যসাচীর ছিলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা ফাঁসির অনিবার্য সম্ভাবনা। তাই সুমিত্রা সঙ্গতভাবেই দেশের ও দলের এত বড়ো শত্রুতা যে করলো সেই অপূর্বকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু সব্যসাচী তা কার্যকর হতে দেন নি, কোনো শাস্তি না দিয়ে অপূর্বকে মুক্তি দেন। এর কারণ হিসেবে সব্যসাচী বলেছেন—'আমি বাঁচাতে গেলাম ভগবানের দেওয়া এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নরনারীকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে তার কি দাম আছে নাকি যে, ব্রজেন্দ্রের মত বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে?' অর্থাৎ অপূর্ব-ভারতীর অমূল্য প্রেমকে বাঁচানোর জন্যই তিনি অপূর্বকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু প্রেমের প্রতি মহাবিপ্লবী সব্যসাচীর এই শ্রদ্ধা যতই তার গভীর মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হোক, সন্ত্রাসবাদের বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। আর সেই জন্যই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলের অন্যান্যদের সঙ্গে সব্যসাচীর গুরুতর মতভেদ হয়; এবং পথের দাবী ভেঙে যায়। সুতরাং অপূর্ব-ভারতীর রোমান্টিক প্রেমের শেষরক্ষা হলো বলে পাঠক যতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলুক, বিশ্বাসঘাতকতার মতো গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না হওয়ায় পাঠকের ভাবনাও হয়। এখানে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শরৎচন্দ্র পাপের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান্ হন নি।

আট

সুতরাং দেখা গেলো, শরৎ-সাহিত্যে পাপী সম্পর্কে মানবিক সহানুভূতি, কঠোর মনোভাব ও অসতর্ক শৈথিল্য এই তিনেরই পরিচয় আছে। তুলনামূলক-ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই তিনের মধ্যে প্রথমটিই বেশি প্রকাশমান ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। পাপীর আন্তর প্রেমের মতো মানবিক ঐশ্বর্যের কথা যেখানে আছে সেখানেই লেখকের হৃদয়রসে অভিষিক্ত কাহিনী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এতে, স্বীকার করে নেওয়া ভালো, পাপ সরে গেছে একটু পেছনে; তার চারিত্র্যও একটু আচ্ছন্ন ও স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র এটা যে করলেন তার একটা ভালোর দিকও আছে। পাপ ও পাপীকে চিরকালের জন্য নরককুণ্ডে ফেলে রাখা সমাজের দিক থেকে যেমন খারাপ, তেমনি খারাপ সাহিত্যসম্মত চরিত্রবিকাশের দিক থেকেও। পাপীর উত্তরণ ও উর্ধ্বায়ন দু'দিক থেকেই কাম্য। পাপীর যদি মুক্তি না হয় তবে সমাজের দিক থেকে ক্ষতি, চরিত্র হিসেবে পাপী—যদি এগিয়ে না যায়—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে—তবে সাহিত্যের দিক থেকে ক্ষতি। শরৎচন্দ্র পাপীর সদ্‌গুণের সন্ধান করে তার চরিত্রকে যে তার ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন তাতে পাপীর উত্তরণের সমস্যা সমাধানের একটা পথ পাওয়া গেছে। যেখানে অধঃপতিত মানুষ ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, যে সমস্ত কারণে জীবন ভেঙে যায় ও গড়ে ওঠে তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, সেখানে উত্তরণ বাস্তব জীবনায়নের মধ্যে বিধৃত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঠিক সেইভাবে কঠোর জীবনসংগ্রাম ও আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে পাপীর উত্তরণের চিত্রটি না দেখিয়ে পাপীর ভেতরেই এক প্রেমালোকিত কক্ষ আবিষ্কার করেছেন এবং সেই কক্ষপথে চরিত্রকে আকর্ষণ করে তার উত্তরণকে সম্ভাবিত করে তুলেছেন। এও উত্তরণের একটি পথ। সে পথ সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও তার দিকে শরৎচন্দ্র যে সহৃদয়তার সঙ্গে চোখ ফিরিয়েছেন তাতে একালের পাঠকও চমৎকৃত হয়। তাতে যদি পাপের ভয়ঙ্করতার চিত্র আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবু শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি নেই, কারণ পাপীর উত্তরণ সেই ক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে দেয়।

পরিশেষে একথা মনে রাখা দরকার যে, শরৎ-সাহিত্যের পাপীরা কেউ তাদের পাপের কথা গোপন করে নি—পাপ যে তাদের জীবনে আছে একথাও তারা সকলেই জানে। পাপ সম্পর্কে তারা সচেতন, তার অধিষ্ঠান তাদের সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যে। এটা একটা বড়ো কথা। কারণ 'Man knows that he is wretched, so he is wretehed, since this is the fact ; but he is also impressively great, because he does know that he is wretehed ?'[১] শরৎ-সাহিত্যের পাপী চরিত্রগুলি সম্বন্ধে প্যাসকলের এই নিত্যকালের আধুনিক কথা আজ স্মরণ করছি।

১. Pense'es, No. 416, Pascal. Quoted by A. Toynbee in his Historical Approach to Religion.

ব্যক্তি ও সমাজ : সামঞ্জস্যবোধ

এক

একথা প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে, শরৎচন্দ্র সমাজ মানতেন। সমাজের অস্তিত্বে তাঁর আস্থা ছিলো, কেন না একটা সামাজিক আশ্রয় ছাড়া মানুষের চলতে পারে না। তবে সমাজ বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে কোনো সূক্ষ্ম গবেষণায় তিনি রত হন নি। তিনি মোটামুটি বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন সমাজের মোটা রূপটার সঙ্গে। 'যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজকর্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসব-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি।'[১] —এই ঘোষণায় শরৎচন্দ্রের সমাজসম্পর্কিত কোনো তত্ত্বদর্শন উচ্চারিত হয় নি, একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে সমাজকে দেখে ও পায় তারই সরল সত্য স্থাপিত হয়েছে। জড়বাদী ঐতিহাসিক বা তত্ত্বদর্শী সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমাজ জিনিষটা প্রতিবেশিতার সংঘাত-সংযোগের চেয়েও গভীরতর ও জটিলতর একটা সংগঠন—তার উদ্ভব ও বিকাশের মূলে কাজ করে শ্রেণীস্বার্থের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। শরৎচন্দ্র সেই সামাজিক ভিত্তিমূলে দৃষ্টিপাত না করে শুধু তার বাহ্য অবয়বটাই গ্রাহ্যের মধ্যে এনেছেন—তার স্থূল কাঠামোর দিকেই মনঃসংযোগ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই সমাজ যে নিষ্কলুষ ও ত্রুটিহীন, এমন নয়। কিন্তু সেটা হচ্ছে পরের প্রশ্ন। তার আগের কথা হচ্ছে যে, ভালো হোক মন্দ হোক সমাজকে মেনে নিতে হবে, তার অস্তিত্বের সার্থকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা চলবে না; তার কোনো কোনো বিধি-ব্যবস্থা বা শাসন-অনুশাসন সম্পর্কে প্রতিবাদ বা প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ? নৈব নৈব চ। তিনি লিখিত সাক্ষ্যে স্পষ্ট করেই বলেছেন—'আমি সমাজের কথাই বলি। রাজার আইন রাজা দেখিবেন, সে আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক আইন-কানুনে—ভুল-চুক অন্যায়-অসঙ্গতি কি আছে না আছে, সে না হয় পরে দেখা যাইবে;—

১. সমাজ-ধর্মের মূল্য, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, সপ্তম সম্ভার।

কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবির অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুল-ভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দুই চারিজন সঙ্গী লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা যায় না।'[২] তিনি আরও মনে করতেন—সমাজ যদি তার শাস্ত্র ও অন্যায় দেশাচারে কাউকে ক্লেশ দিতে বাধ্য হয়, তবু তার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবি বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোনো পৌরুষ নেই, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। এই সব বক্তব্যে সমাজকে একটা সর্বাশ্রয়ী ও অপরিহার্য শক্তি হিসেবে দেখার চেষ্টা আছে। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্র এখানে ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে বড়ো করে দেখেছেন এবং সেদিক থেকেই সমাজধর্মের মূল্য নির্ধারণ করেছেন।

দুই

'সমাজ-ধর্মের মূল্য' প্রবন্ধ লেখার সময় শরৎচন্দ্রের মানসিক অবস্থা কি ছিলো, আজ তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তাঁর সেই সময়কার মননধারার স্তর নির্দেশও কষ্টকর। বস্তুতঃপক্ষে যিনি 'শেষ প্রশ্ন' লেখার পর 'বিপ্রদাস' লিখেছেন, তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্ন অগ্রগতি সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত দেওয়া শক্ত। মনে হয়, যে মৌল বিশ্বাস নিয়ে তিনি লেখকজীবন শুরু করেছিলেন, কখনও কখনও তার চেহারায় রদবদল ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নি। তবু একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সামাজের ওপর যে গুরুত্ব তিনি এখানে আরোপ করেছেন, তার মূলে আছে বর্মাবাসী বাঙালির সমাজবন্ধনহীন বিশৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর বিষণ্ণ অনুভব ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। তাছাড়া তিনি এই সময় মনোযোগ দিয়ে হার্বার্ট স্পেনসার পড়েছিলেন এবং তাঁর সমাজসম্পর্কিত বক্তব্যের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত ছিলেন। তাই বর্মায় লিখিত সমাজ-ধর্মের মূল্য প্রবন্ধে সমাজের ওপর জোর পড়েছে খুব বেশি। এই কারণে নানা সময়ে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলিও একটু খতিয়ে দেখার দরকার।

২. তদেব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়বে 'পল্লীসমাজ'-এর কথা। পিতৃবিয়োগের পর রমেশের গ্রামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু। অশৌচান্তের সামাজিক দায় নিয়ে সে অনেকদিন পর কুঁয়াপুর এসেছে। ইচ্ছা করলে সে পশ্চিমে থেকেই, কাশীর মতো কোনো পবিত্র তীর্থস্থলেই পিতৃশ্রাদ্ধের দায় সারতে পারতো। কিন্তু রমেশ তা করে নি—পিতার শেষ কাজের সামাজিক কর্তব্য সে সামাজিকভাবেই সম্পন্ন করার সঙ্কল্প করেছে। হয়ত রমেশের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন ও সকলকে নিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনের পেছনে তার স্বার্থবুদ্ধির কিছু তাগিদও আছে—কারণ সে হবে অতঃপর বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। যে শ্রেণীস্বার্থবোধ মানুষের অস্তিত্বের সামাজিকীকরণে জরুরি সূত্র, রমেশের সজ্ঞান অভিপ্রায়ে না হোক অবচেতন বোধে তার ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অ্যাভ্যাসিক কর্তব্যবোধেই হোক আর স্বার্থবুদ্ধির প্রণোদনাতেই হোক, রমেশ যে গ্রামে এসে সমাজে প্রবেশ করেছে এটা বর্তমান প্রসঙ্গে একটা বড়ো কথা। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে সে রমাকে অনুনয়ের সঙ্গে বলেছে—'আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তা হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারছি না।' এখানে নিরাশ্রয়ের সামাজিক আশ্রয় খোঁজার যে চেষ্টা তা সমাজ-শাসনের গুরুত্বই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলার সমাজের একটা পুরোপুরি ছবি উপন্যাসটিতে আছে। রমেশের পিতৃদায়-মোচনে প্রথমেই এগিয়ে এসেছে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর দল, কিন্তু অচিরেই তা নিয়ে ঘোঁট পাকাতেও তারা দ্বিধা করে নি; এমন কি শ্রাদ্ধের দিন ক্ষ্যান্ত-মাসির মেয়ে সুকুমারীর পদস্খলনের অস্পষ্ট অভিযোগ নিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন পণ্ড করতে এগিয়ে যায়। অথচ এরাই সুকুমারী মরলে কাঁধ দিতে প্রস্তুত। আসলে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর দল নিম্নস্তরের মানুষ—স্বচ্ছল সমাজপতিদের উচ্ছিষ্টভোজী—কিন্তু বংশকৌলীন্যের জোরে সমাজ-শাসনের ধ্বজাধারী। এদের নেতা বেণী ঘোষাল যেন এক দুষ্টচক্রের অধিনায়ক—সেই চক্র রমেশকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, এমন কি স্বদলভুক্ত রমাকে পর্যন্ত স্বার্থবোধের খাতিরে ছোবল মারতে উদ্যত। সমাজটা যে বেণী-রমার দিকে ঝুঁকেছে তার কারণ তাদেরই হাতে অর্থ ও ক্ষমতা। তারা যে রমেশকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় না তার কারণ তাতেই তাদের স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা। বেণী স্পষ্ট করেই বলেছে—'রমা, বাঁশ (অর্থাৎ রমেশ) নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা, পেকে গেলে আর হবে না তা নিশ্চয়

বলে দিচ্ছি। বিষয়সম্পত্তি কি করে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখে নি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্মূল করতে পারা যায় ত ভবিষ্যতে আর যাবে না।' এদের বাধাতেই রমেশ সমাজের উপকার করতে গিয়েও বার বার হোঁচট খেয়েছে—স্কুল গড়তে গিয়ে পেয়েছে বাধা, রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে পেয়েছে বিদ্রূপ, জলমগ্ন ফসলের মাঠ বাঁচাতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছে লাঠিয়ালের। তাই একসময় ক্ষুব্ধ রমেশের মুখে শুনি—'এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে; ভাল করলে গরজ ঠাওরায়; ক্ষমা করাও মহাপাপ, ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল!' তাই সে বিরক্ত হয়ে কুঁয়াপুর ত্যাগের সঙ্কল্প নেয়।

কিন্তু বাধা দেন জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী। তাঁর মতে, সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও সমাজের মানুষগুলির ওপর বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। ওরা কত দুঃখী, কত দুর্বল—তাই ওরা রাগেরও অযোগ্য। এই বিধ্বস্ত সামাজিক চরিত্র দেখেও সমাজেই থাকতে হবে—জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া চলবে না। বিশ্বেশ্বরী আরও বলেছেন—'সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হলে ত কোন মতে চলতে পারে না, রমেশ!'

'ভাবিয়া দেখিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, শুধু এরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেণীও সমাজের একজন কর্তা!

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করোগে রমেশ! সবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এঁদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।'

এখানে শরৎচন্দ্র বিশ্বেশ্বরীর মাধ্যমে সমাজশক্তির সপক্ষে জোরালো ওকালতি করেছেন। তিনি যেন বলতে চান, সমাজ সমস্ত ভালোমন্দ নিয়ে আছে, থাকবে। তাকে বিধ্বস্ত করা কিংবা মেনে না চলা শুভ নয়। বেণীর মাথায় লাঠি পড়েছে তার অন্যায়কর্মের শাস্তিস্বরূপ—কিন্তু তাই বলে সমাজের মাথায় লাঠি চালানো ঠিক নয়। অথচ এখানেই শরৎচন্দ্র থামেন নি, তিনি আরও এগিয়েছেন। রমেশ

যেন বাইরে থেকে এসে অনেক উচুতে বসে সমাজের ভালো করতে চেয়েছে। কিন্তু এমন করে সমাজের ভালো করা যায় না। আগে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে ভালোতে মন্দতে এক না হতে পারলে কিছুতেই ভালো করা যায় না। রমেশ প্রথমে তাই করেছিলো বলে কেউ তার নাগালই পায় নি। কিন্তু অনেক বাধাবিপত্তি ও দুঃখকষ্টের স্তর পেরিয়ে রমেশ যখন সকলের সঙ্গে এক ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে একমাত্র তখনই সে অর্জন করেছে সমাজের ভালো করবার যোগ্যতা। তাই রমা শেষ বিদায়ের দিনে রমেশকে বলেছিলো—'আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা-বিঘ্ন পেয়েছ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভারে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ বলেই তোমার ভয় হচ্ছে; আগে হলে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম-সমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।' এ বক্তব্যে শরৎচন্দ্র সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এবং যে সমাজের আশ্রয় মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক তার কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন।

তিন

শরৎচন্দ্রের সমাজ সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা ছিলো। তাই তাঁর অনেক উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে বাংলার সমাজ। এই সমাজের বাইরের ও ভেতরের চেহারাটা তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন। সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষকে তিনি চিনেছিলেন ঠিকই—তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তিনি পোষণ করতেন—তবু এদেশের বাস্তব সত্য হিসেবে তিনি জমিদার এবং উচ্চবিত্ত ভূম্যধিকারী ও উচ্চবর্ণের মধ্যস্বত্বভোগীদের চিত্রই বেশি এঁকেছেন। কারণ শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন, এরাই হচ্ছে বাংলার সমাজের শাসক ও ভাগ্যনিয়ন্তা। এদের দাপটে সমাজের নাভিশ্বাস যে উঠেছে এটাও তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তবু তিনি সমাজের ভাঙনের পক্ষে ওঠে-পড়ে লাগেন নি। পল্লীসমাজ ছাড়া দেনা-পাওনা উপন্যাসেও গ্রাম-বাংলার সমাজ-কাঠামোর আস্ত একটা চালচিত্র পাই। এতে একদিকে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী শাসন ও শোষণ চালিয়ে

সাধারণ মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে চলেছে, অন্যদিকে জনার্দন রায়, শিরোমণি মহাশয়, এককড়ি নন্দী ইত্যাদি সমাজপতির দল সমাজশাসনের নামে ব্যক্তিস্বার্থের সীমানা বাড়িয়ে চলেছে। এমন কোনো অন্যায় নেই, ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করতে পারে না ; এমন কোনো মিথ্যাচরণ নেই যার শরণাপন্ন হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। বস্তুতঃ ঘুণ-ধরা সমাজের এমন নিখুঁত চিত্র প্রায় দুর্লভ। তবু উপন্যাসটিতে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো ধ্বনি নেই ; ভাঙনের সপক্ষে কোনো রোষকষায়িত ভ্রূভঙ্গি নেই, কোনো অশ্রুজলের ওকালতিও নেই। যে সমাজপতি জনার্দন রায় ষোড়শীর চণ্ডীর ভৈরবীপদ হারানোর কারণ, তাকে শাস্তির হাত থেকে উদ্ধার করেছে ষোড়শী। কারণ জনার্দন তার চোখে আর সমাজপতি নয়, বন্ধু হৈমর বাবা। আসলে শরৎচন্দ্র এখানে সমাজকে অক্ষত রেখেই জীবানন্দ-অলকার মিলন ঘটাতে চেয়েছেন।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিদ্রোহ করেছে। সে-সব স্থলে শরৎচন্দ্র কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন সেটা বর্তমান আলোচনায় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সেই সব বিদ্রোহের স্থানপটভূমি বাংলার ভূগোলের বাইরে—অচলার ক্ষেত্রে ডিহরি (বিহার), কমলের ক্ষেত্রে আগ্রা (উত্তরপ্রদেশ), অভয়ার ক্ষেত্রে রেঙ্গুন (বর্মা)। সবিতার ক্ষেত্রে ঘটনাস্থল কলকাতা বটে—কিন্তু সে বিদ্রোহ করে নি, রিপুর তাড়নায় পদস্খলিতা হয়েছে। এবং রমণীবাবুর ঘরে প্রায় গণিকার মতো বাস করেছে। বারবনিতারা চিরকাল আছে এবং থাকবে, কিন্তু সংসার-সীমান্তে বাস বলে তাদের জীবনাচরণের কোনো গুরুতর সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঘটে না। বরং তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, তারা পরোক্ষে সমাজের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে। সে যাই হোক, অচলা-কমল-অভয়ার বিদ্রোহ যে শরৎচন্দ্র বাংলার বুকে ঘটতে দেন নি তার কারণ তিনি সামাজিক বিশৃঙ্খলা কামনা করেন না। এর মধ্য দিয়ে কোনো সুদূরপ্রসারী খননকার্য চালানো তাঁর লক্ষ্য নয়। কমলের বিপ্লবাত্মক আদর্শের কিছু আলোড়ন আগ্রার বাঙালি সমাজে হয়েছে বটে, কিন্তু সে-সমাজ স্থায়ী সংগঠন নয় — কর্ম বা অন্যান্যসূত্রে কিছু লোকের একত্র সমাবেশ মাত্র। সুতরাং কমলের বিদ্রোহের আঁচ যে বাংলার বুকে এসে পৌঁছোবে না এটা ধরে নিয়েই শরৎচন্দ্র তাকে আসরে উপস্থিত করেছেন। এক ঝড়-জলের রাত্রিতে অচলার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া এনেছে রামবাবুর মনে, কিন্তু তিনিও বাংলার সমাজের প্রতিভূ নন, বিহারপ্রবাসী একজন নিষ্ঠাবান

ব্রাহ্মণ মাত্র। অভয়ার স্বামী-সন্ধানে বর্মা-যাত্রার কোনো সঙ্গত যুক্তি ছিলো কি না সন্দেহ, কারণ যে স্বামী দীর্ঘদিন নবপরিণীতা স্ত্রীর খবর নেয় নি সে যে সহজে তাকে গ্রহণ করবে না এটা অভয়ার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে স্বামীর নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহ করেছে। এ ধরনের নির্যাতন কিন্তু বাংলার মেয়েরা বরাবর সহ্য করতে বাধ্য হয়, তবু তারা স্বামী ত্যাগ করে না। আসলে উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রকন্যা তার জন্মভূমির সমাজ-বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্রোহ করবে এটা শরৎচন্দ্র চান নি, অভয়াকে দিয়ে বিদ্রোহ করাবেন বলেই তিনি তাকে সুদূর বর্মায় টেনে নিয়ে গেছেন। আর তার বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া হয়েছে একজন মাত্র মানুষের মনে—সে শ্রীকান্ত, যে কি না ভবঘুরে উদাসীন ব্যক্তি, যার কি না সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধটা কতকটা অসংলগ্ন। সুতরাং একথা সত্য যে, শরৎ-সাহিত্যের বিদ্রোহিণীরা তাদের বিপ্লবের 'ক্ষেত্রে' স্রষ্টার ইচ্ছার—সমাজে আলোড়ন না তোলার ইচ্ছার—দাসত্ব করেছে। তাই তাদের জীবনভূমি নির্দিষ্ট হয়েছে বাংলার বাইরে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরা ব্যক্তিধর্মের তাগিদে বিদ্রোহ করেছে বটে, কিন্তু সমাজকে কি উপেক্ষা করতে চেয়েছে? সমাজকে কি ভাঙতে চেয়েছে? রোহিণীকে গ্রহণ করার সময়ে অভয়া জানতো যে তাদের এ মিলন সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না, তাদের ভাবী সন্তানরা পাবে না সামাজিক মর্যাদার জন্মগত অধিকার। এ-নিয়ে শ্রীকান্তের সঙ্গে তার কিছু আলোচনা হয়েছিলো। তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি—

'তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে (অর্থাৎ মুসলমান সমাজের মধ্যে) আমাদের তুলে নেবার উদারতা আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?

ইহার কি জবাব ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

…অভয়া ম্লানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব।'

এখানে স্পষ্টতঃই শ্রীকান্ত ব্যক্তির জন্য সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করার বিপক্ষে, অভয়া বিদ্রোহ সত্ত্বেও সমাজে থেকে যাওয়ার সপক্ষে। এখানে ভাঙনের আইডিয়াকে সমাজের দিক থেকে কোনো দিক থেকেই তুলে ধরা হয় নি।

অচলার এক রাত্রির অপরাধ—পরপুরুষের কাছে আত্মদানের বিদ্রোহ— তা তার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিলো কি না সেটা মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং সে-বিষয়ে পূর্বের এক বক্তৃতায় আলোচনা করেছি। কিন্তু সেই ঘটনার পরেই সে বুঝতে পেরেছিলো, সমাজে তার আর স্থান নেই। সমাজ এ-ধরনের অপরাধ প্রশ্রয় দেবে না। তৎসত্ত্বেও অচলা সমাজ ছাড়তে চায় নি, সমাজকে আঁকড়ে ধরেই সে বাঁচতে চেয়েছিলো। সে আরও জানতো, তার সেই সামাজিক অস্তিত্ব নির্ভর করছে মহিমের ওপর। তার সেই ইচ্ছার আভাস পাওয়া যায় মহিমের সঙ্গে তার আলোচনার মধ্যে—

'মহিম আসিয়া দেখিল, সে কেরোসিনের আলোটা সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে; কহিল, এখন তুমি কি করবে?

আমি? বলিয়া অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল; শেষে বলিল, আমি ত ভেবে পাই নে। তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই করব।…

(মহিম) সহজ গলায় বলিল, আমি কেন হুকুম দেব অচলা, আর তুমিই বা তা শুনতে বাধ্য হবে কিসের জন্য?

কিন্তু তুমি ছাড়া আর যে কেউ নাই—কেউ ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না, বলিয়া অচলা তেমনি এক ভাবেই মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।'

কিন্তু মহিমের দিক থেকে সাড়া পাওয়া গেলো না। অচলার সামাজিক আশ্রয় হারিয়ে গেলো চিরদিনের জন্য। এর পর আশ্রম খোঁজা ছাড়া তার আর গত্যন্তর রইলো না। কিন্তু এ যে সে চায় নি, তার আভাস আছে জলে টল-টল তার চোখ দুটির মধ্যে।

কমল যে জীবনদর্শনের প্রবক্তা তাতে ব্যক্তিই বড়ো, সমাজ নয়। তার

সমাজবোধ জন্মগত ভাবেই গড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি— কারণ তার বাবা ছিলেন ইংরেজ, মা ছিলেন কুলটা। যে রক্তগত সংস্কার সমাজবোধ তৈরিতে একটা বড়ো ভূমিকা নেয়, কমলের জন্মের অসামাজিক উৎস সেই সমাজবোধের উদ্ভব ও বিকাশে কার্যকর ছিলো না। পিতার কাছ থেকে পাওয়া তার বুদ্ধির শিক্ষাও 'প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে' দিতে তাকে সাহায্য করেছিলো। তাই সে সামাজিক মতামত মেনে নিয়ে অবিবাহিত পুরুষকে নিয়ে এক ঘরে রাত কাটাতে অস্বীকার করে না, এ-নিয়ে নিন্দা-অপযশও গ্রাহ্য করে না, যদিও কমল কোথায়ও স্পষ্ট করে বলে নি—আমি সমাজ মানি নে, তবু তার ব্যক্তিদর্শন যে সামাজিক শাসনেরই প্রতিস্পর্ধী, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু কমলের ক্ষেত্রে সমাজের গুরুত্ব স্বীকৃত না হলেও— অবশ্য তা স্বীকারের উপায়ও ছিলো না— সবিতার ক্ষেত্রে তা উপেক্ষিত হয় নি। সে কামের পীড়নে সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে যে জীবন যাপন করেছে, তা থেকে মুক্তি নিয়ে সে সমাজে এবং স্বামীর সংসারে পুনঃপ্রবেশের স্বপ্নও দেখেছে। একদিন সবিতা গেছে ব্রজবাবুর বাড়িতে। তিনি স্নান করছিলেন। সবিতা কবাট ঠেলে স্নানঘরে ঢুকে গেলো। তারপর—

'সবিতা কহিলেন, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আমায়?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিলেন, যদি না যাই তোমার সুমুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমায়?…

এখানে থাকবে, নিজের বাড়ীতেও যাবে না?

না। নিজের বাড়ী আমার এই, যেখানে স্বামী আছে সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়ীতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।'

বুঝতে কষ্ট হয় না, সমাজবৃত্তে প্রত্যাবর্তনের কামনা থেকেই শেষের পরিচয়ের সবিতার এই রকমের উক্তি ও আচরণ।

চার

শরৎচন্দ্র যে সমাজ মানতেন তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণও তাঁর সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। সমাজ বস্তুটা মানুষের পক্ষে কতটা জরুরি এবং তা না থাকলে মানুষের

ক্ষতি কতটা, তার ছবি আছে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব ও পথের দাবীতে। রেঙ্গুন-গামী জাহাজে ছিলো ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক— 'কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্যন্ত এই কয়লাঘাটে (অর্থাৎ জাহাজ ঘাটে) প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।' যাত্রীরা জাহাজের খোলের ভেতর নিজের নিজের স্থান করে নেয় যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। কিন্তু এক অপরাহ্নে সামুদ্রিক ঝড়ে সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের ভাষায়—'মেয়েরা শিলের ওপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে।' এ যেন, হুমায়ুন কবির ঠিকই বলেছেন, সমাজ-বন্ধনহীন জীবনের তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার একটা প্রতীকভাষ্য। বর্মায় শরৎচন্দ্র এ-ধরনের জীবনচিত্রই দেখেছেন।

পথের দাবীতে তার দৃষ্টান্ত আছে। 'শরৎচন্দ্র একটি বর্মী পরিবারের চিত্র এঁকেছেন যার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাদ্রাজের এক মুসলমানের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ; দ্বিতীয় কন্যা চট্টগ্রামের এক ভারতীয় পর্তুগীজের সঙ্গে, তৃতীয় কন্যা একজন এ্যাংলো-ভারতীয়ের সঙ্গে এবং চতুর্থ কন্যা একজন ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা চীনার সঙ্গে। আর, শুধু এই একটি মাত্র ঘটনাই নয়। আখ্যায়িকার যিনি নায়িকা সেই মেরী ভারতী হচ্ছেন একজন বাঙালি ব্রাহ্মণের কন্যা, যিনি স্ত্রী-কন্যাসহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।…এই ভাবে সকল সামাজিক বিশ্বাস ও প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির জীবন চরম স্বেচ্ছাচারিতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। বেশীর ভাগ দেশত্যাগীদের জীবন এই কর্দমে কর্দমাক্ত হয়েছিল। নিজের দেশের সমাজে যে সামাজিক জীবনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছিল তা পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে তারা কোন নূতন সর্ববাদিসম্মত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। তার ফলে তারা একটা এমন সামাজিক আবহাওয়ায় পড়েছিল, যেখানে স্বার্থপরতা ও রিরংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কাম-প্রবৃত্তি ও অবাধ যৌন অনাচার প্রকাশে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি, এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[৩]

এখানে স্মর্তব্য যে, শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন—অন্ততঃ কতকাংশে—সামাজিক রীতিনীতি না-মানা মানুষ। তিনি অনেকদিন নিরঙ্কুশ জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছিলেন। ফলে তিনি কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন বর্মাবাসী সেই

৩. হুমায়ুন কবির, শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৩৬৪), পৃ. ২৩।

সব ভারতীয়দের যারা দেশের সমাজ ও সংস্কার থেকে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন। সেই সব শিথিল জীবনযাত্রার শরিকদের নৈতিক অধঃপতন ও মানসিক অবক্ষয়ের চেহারাটা তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। সেখানকার পুরুষদের অধঃশাখ বিবেক ও ভাসমান চরিত্র, মেয়েদের বিধ্বস্ত সতীত্ব ও রুচিগত দৈন্য সমাজশাসনের অভাবে এমন এক ন্যক্কারজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যা শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সমাজবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাঁচ

অথচ শরৎ-সাহিত্যে সমাজের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ জমা হয়ে আছে। সে-নালিশ ব্যক্তির, বিশেষ করে নারীর। সমাজের দিক থেকে যখন দেখেছেন তখন মানুষের সমাজ-বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা শরৎচন্দ্রের চোখ পড়েছে—তার অভাবে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈতিক শিথিলতার, নির্লজ্জতা ও স্বার্থপরতার রোমহর্ষক চিত্র তিনি দেখেছিলেন। তাই সমাজভাঙার কোনো প্রশ্ন তাঁর মনে প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু বিষয়টাকে ব্যক্তির দিক থেকে দেখতে গিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভও তাঁর মনে জমে উঠেছিলো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতীয় সমাজের শাসনযন্ত্রগুলি, যা সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির নামে পরিচিত, তা ব্যক্তিমানুষের সৃজনশীল আত্মপ্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। মানুষের ব্যক্তিসত্তার সম্যক স্ফুরণে সহায়ক হওয়া দূরে থাকুক, তা বর্তমানে সংরক্ষিত স্বার্থধর্মের পরিপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ সামাজিক সংস্কার ও নিয়মকানুনগুলি মানুষের সঙ্গে নাড়ীর যোগ হারিয়ে নির্জীব ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগে আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থের খেলা খেলছে ক্ষুদে-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক শক্তিগুলি। সামাজের বিধিনিষেধগুলি যতক্ষণ সজীব ততক্ষণ তাদের কাজ হচ্ছে ব্যক্তির স্খলন-পতনকে চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তার মানবিক বিকাশ সহজ ও সুন্দর করে তোলা। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন, প্রচলিত নিয়মকানুনগুলি সেই মৌল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির আত্মপ্রকাশে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই শরৎ-সাহিত্যে সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির অভিযোগ ও আক্রোশ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

পল্লীসমাজে রমা ও রমেশের কাহিনী সেই নালিশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা পরস্পরকে ভালোবাসতো, সেই ভালোবাসা ছিলো আবাল্যের। তারা এও

জানতো, একদিন তাদের বিয়ে হবে। কিন্তু কুলগত মর্যাদার সামান্য হের-ফেরের জন্য তাদের বিয়ে হলো না। অনেক দিন পর রমেশ পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে গ্রামে ফিরে এলো। তখন রমা পিতৃগৃহবাসিনী বিধবা। এর পরে দুজনের মধ্যে চললো অনেক টানাপোড়েন—আপাত-শত্রুতার পাকচক্রে তারা ঘুরে মরলো বেশ কিছুদিন। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে তারা যখনই পরস্পরের কাছে এসেছে তখনই দেখা গেছে তাদের হৃদয় মরে নি। মরে নি তাদের ভালোবাসা। তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গেলো তারকেশ্বর-দৃশ্যে, রমার কাশীযাত্রার প্রাক্কালে রমা-রমেশের কথোপকথনে। তবু সামাজিক নিয়মে তাদের মিলনের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। যে অগাধ হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও মানবিক গুণ নিয়ে তারা সংসারে এসেছিলো—যার পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া গেছে বারে বারে—পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্যে তার প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ বিনষ্ট হয়ে গেলো। একজন গেলো কাশীতে, আরেকজন পুঞ্জীভূত বেদনাভার নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার জন্য গ্রামে রয়ে গেলো। শুধু যাওয়ার আগে রমা রমেশকে দিয়ে গেলো তার স্নেহের পাত্র যতীনের ভার ও নিজের কিছু সম্পত্তি। যে মিলন ঈপ্সিত ছিলো, অথচ বাস্তবে যা সম্ভব হলো না, যেন তারই প্রতীকভাষ্য রূপে রমা রমেশের হাতে তুলে দিলো যতীনকে। শরৎচন্দ্র দেখালেন, সামাজিক বিধিনিষেধে একটি কামনার মর্মান্তিক মৃত্যু। কাহিনীতে এই প্রশ্নই মুখর হয়ে উঠেছে যে, কেন এমন হবে? অন্যত্র শরৎচন্দ্রের উক্তিতেও এ কথাটাই ধ্বনিত হয়েছে—'রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোনকালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এতবড় দু'টি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি।'[৪] অন্যত্র বলেছেন—'আমি দেখালুম গ্রামে নায়কের মতো একটি মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাদের উৎপীড়িত করলে। সমাজের

৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, অষ্টম সম্ভার।

কি gain হ'লো। এ দুটি জীবনের যদি মিলন হ'তে পারতো, এ জিনিষটা যদি সমাজ নিতে পারতো, তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হ'তো। আমরা তাদের repress করলাম; দুটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম,...।'[৫] যে হিন্দু সমাজে রমা-রমেশের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেলো সেই হিন্দু সমাজকে শরৎচন্দ্র এখানে দুটি নরনারীর পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের বিচারশালায় অভিযুক্ত করেছেন। এখানে ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার। শরৎ-সাহিত্যে যেখানেই বিধবার ভালোবাসার কথা, সেখানেই তার ব্যর্থতার সূত্র ধরে সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে বা প্রচ্ছন্ন ভাবে স্রষ্টার অসন্তোষ জমা হয়ে উঠেছে।

ছয়

শরৎ-সাহিত্যে পতিতাদের পক্ষ থেকেও অনেক অভিযোগ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। সে অভিযোগও বস্তুতঃ পক্ষে সমাজ-সম্পর্কিত। পতিতারা যে কোনো কারণেই হোক পদস্খলিতা হয়ে সমাজে ধিক্কৃত হয়। তাদের সংসার-সীমান্তে পরিত্যাজ্য করে রাখাই সামাজিক নীতি। তারা ভদ্রজীবনের সমস্ত রকমের মর্যাদা হারিয়ে অধঃপতিত জীবন যাপন করে। শুধু সামাজিক মর্যাদা নয়, মানবিক মর্যাদা থেকেও এরা বঞ্চিত। এই সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক্ষোভ শরৎ-সাহিত্যে আছে। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সতীত্বের চেয়ে নারীত্ব বড়ো। কোনো কারণে নারী সতীত্ব হারাতে পারে, কিন্তু তাই বলে তারা নারীত্ব হারাবে কেন? তাদের মানবীত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে-সব পতিতা-চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাদের জীবনকথার মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিসত্তার অন্তর্গূঢ় ক্রন্দন ছড়িয়ে আছে। সমাজনীতি উপেক্ষা করে তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার হঠকারিতা শরৎচন্দ্র দেখান নি সত্য, কারণ তিনি তাতে সমষ্টির কল্যাণ দেখতে পান নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পতিতাদের মানবিক গুণের ছবি এঁকে তিনি তাদের হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমাজের সামনে। এদের নারীত্বের মানবিক ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত থেকে সমাজ কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না? পঙ্গু হয়ে থাকছে না? এ-সমস্যা কেমন করে সমাধান করা হবে, সে দায়িত্ব শরৎচন্দ্র নিজের হাতে তুলে নেন নি। শুধু প্রশ্ন তুলেই ও পতিতাদের বেদনার বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থেকেছেন।

৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-সভার অধিবেশনে অভিভাষণ, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ত্রয়োদশ সম্ভার।

চন্দ্রমুখী, বিজলী, সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী তাদের জীবনে খুঁজে পেয়েছে প্রেমের অনাস্বাদিতপূর্ব ঐশ্বর্য। সেই প্রেমে তাদের জীবনের নানা কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠেছে। নতুন জীবনের আলোর সন্ধান পেয়ে তারা মনে মনে কামনা করেছে ঘর, সংসার, স্বামী, সন্তান। রাজলক্ষ্মী তো স্পষ্ট করেই বলেছে, মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোন্ মেয়ের না থাকে! কিন্তু অতীতে যে অন্ধকার তাদের জীবন গ্রাস করেছিলো, তা থেকে তাদের মুক্তি কোথায়? তাই পতিতা-প্রেমিকাদের বুকের হাহাকার শরৎ-সাহিত্যে কেবলই গুঞ্জন তুলেছে। আলো জাগলে যেমন আঁধার মরে তেমনি বিজলীর মধ্যে বাইজী মরে গিয়ে জন্ম নিয়েছে প্রেমিকা। কিন্তু সেই প্রেমিকা খুঁজে পায় নি চিরদিনের জন্য বাঁচবার পথ। যে রাত্রিতে বিজলী সত্যেন্দ্রের ছবি মাত্র বুকে নিয়ে সেই প্রেমিকের উৎসবমুখর গৃহ থেকে ফিরেছিলো নিজের পাপগৃহে, সেদিন সেই পতিতার আত্মার ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস নিঃশব্দে মথিত হয়ে উঠেছিলো। তার অন্তহীন আর্তি আছড়ে পড়েছিলো সমাজের দুয়ারে দুয়ারে, যদিও স্পষ্টতঃ কোনো অভিযোগ তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় নি। যে চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালোবেসেছে, তার কল্যাণ কামনা করেছে, কলকাতার পাপের সংসার গুটিয়ে নিয়ে ফুলছড়ি গ্রামে কৃচ্ছ্রতার জীবন বরণ করে নিয়েছে, সে যখন পরজন্মে মিলনের আশ্বাস ছাড়া দেবদাসের কাছ থেকে আর কিছুই পেলো না তখন তার বুক-ফাটা জীবনের বেদনাভরা শ্রুতি কি বিবেকবান সামাজিকের কাছে পৌঁছোয় না? সাবিত্রীর ক্ষেত্রে অবশ্য শরৎচন্দ্র এর চেয়ে বেশি সাহস দেখিয়েছেন। তিনি তাকে উপেন্দ্রের দিদির আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু এ-যুগের সন্দিগ্ধ পাঠক বলবে, যে সাবিত্রীকে লেখক সামাজিক মর্যাদার শোভন মুখশ্রী দিতে পারেন নি, তাকে তথাকথিত মানবিক মর্যাদার মন-ভুলানো মুখোশ পরিয়ে দিয়েছেন। এই 'মহীয়সী দিদির' আসন পেয়ে কি সত্যিই তৃপ্ত হয়েছে তার অন্তরের অন্তস্তল? সে যাই হোক, চন্দ্রমুখী-বিজলী-সাবিত্রীর ক্ষেত্রে সামাজিক চক্রপৃষ্ঠে নিষ্পেষিত ব্যক্তিমনের ব্যর্থতার ধ্বনি পরোক্ষ ভাবে একটা সমাজজিজ্ঞাসার আকার নিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী বাইজী, পতিতা। তার বাইজী-জীবনের ইতিহাস উপন্যাসে সবিস্তারে বিবৃত না হলেও তাতে যে অনেক মন্দ জড়িয়ে আছে তা সে নিজেই বলেছে। তারপর একদিন সে খুঁজে পেয়েছে তার ভালোবাসার মানুষ শ্রীকান্তকে। তার ভালোবাসার ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে উপন্যাসটির চার পর্ব জুড়ে। সেই ভালোবাসা শুধু শ্রীকান্ত নয়, সকল পুরুষের আন্তরিক কামনার বস্তু। কিন্তু তবু সে সামাজিক অর্থে শ্রীকান্তকে পায় নি, তার সঙ্গে মিলতে পারে নি অচ্ছেদ্য

বন্ধনে। তার জীবনের দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে চলেছে শুধু আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা।' এ-দ্বিধা সামাজিক কারণে। সত্য বটে, সে ও শ্রীকান্ত সমাজের ঠিক অন্তর্বাসী ছিলো না। কারণ একজনের ছিলো ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবন, অন্যজনের অসামাজিক ভাসমান জীবন। সুতরাং তাদের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক অস্তিত্ব কার্যকর ছিলো না এবং তাদের মিলনে স্পষ্ট অর্থে কোনো সামাজিক বিধিনিষেধ ছিলো না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমাজ যেখানে স্থূলভাবে উপস্থিত নেই সেখানেও তা ক্রিয়াশীল থাকে সূক্ষ্ম সংস্কারের রূপে। এই সামাজিক সংস্কারই মনে প্রচ্ছন্ন থেকে তাদের মিলনে বাধা দিয়েছে বারে বারে। এ-নিয়ে রাজলক্ষ্মীর অন্তরের টানাপোড়েন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি—ব্রত, উপবাস, ধর্মচর্চা, দীক্ষা ও গুরুসেবা, দানধ্যান, মঙ্গলকর্ম কত কিছুই না করেছে কলঙ্কলিপ্ত জীবনের গ্লানি মোচনের জন্য—তবু নিজেরই অন্তরঙ্গ স্বভাবের সংস্কারপ্রবণতা থেকে তার মুক্তি ঘটে নি। অনুমান করতে কষ্ট হয় না—এত বড়ো একটা মহৎ প্রাণের ব্যর্থতা নিয়ে রাজলক্ষ্মী যতই ঘুরে মরেছে ততই সমাজের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিমনের অসহিষ্ণুতা জমা হয়ে উঠেছে। সে সাধারণতঃ চাপা স্বভাবের মেয়ে—শান্ত, সংযত-বাক্ ও আত্মস্থ। সেজন্যই তার মনের ক্ষোভ অনেক সময়েই অন্তর্গূঢ় থেকেছে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী অন্ততঃ একবার আত্মসংবরণ করতে পারে নি। দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভে শ্রীকান্তের বর্মা-যাত্রার কালে নিজেকে ধরে রাখতে পারে নি রাজলক্ষ্মী। সমাজের রীতিনীতির নির্দয়তা সম্বন্ধে সে প্রশ্ন তুলেছে। সে রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীকান্তকে বলেছে—'দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলছি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়। একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে। ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন।' রাজলক্ষ্মীর এই উক্তির শেষ দুটি ছত্রে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির মর্মজ্বালা যেন তীব্র হয়ে উঠেছে।

সাত

বামুনের মেয়েতে সমাজ ও সামাজপতিদের নিষ্ঠুর পীড়নের ক্রুদ্ধ গল্প বলেছেন শরৎচন্দ্র। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার বলি প্রিয়নাথের মাতা কালীতারা। তাঁর অপরাধ, তিনি স্বভাব-কুলীনের গ্রামে জন্ম নিয়েছেন। আট বছর বয়সে তাঁর যখন বিয়ে হয় তখনই তাঁর স্বামীর পরিবার ছিলো ছিয়াশিটি। স্বামী মুকুন্দ মুখুজ্যের কোনো স্মৃতি সেই ছোট মেয়ের মনে ছিলো না। তাই তাঁর অথর্ব স্বামীর সঙ্গে বখরার চুক্তিতে হীরু নাপিত যখন জামাইয়ের পরিচয় দিয়ে মুখজ্যে পরিবারে

যাতায়াত শুরু করে তখন সেই জালিয়াতি কালীতারা ধরতে পারেন নি। জন্ম হয় প্রিয়নাথ মুখুজ্যের। বহুদিন এ-কথা গোপন থাকলেও কালীতারার পৌত্রী সন্ধ্যার বিয়ে উপলক্ষে তাঁর সর্বনাশের সেই পুরনো কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়। যিনি এই গোপন পাপ উদ্ধার করে সমাজের অকলঙ্ক মহিমা বজায় রাখার 'মহৎ দায়িত্ব' নিয়েছিলেন তিনি সমাজপতি গোলোক চাটুজ্যে। তাঁর চরিতকথাও শরৎচন্দ্র শুনিয়েছেন। তিনি সমাজের মান-মর্যাদা রক্ষায় উদ্গ্রীব—কিন্তু সমাজের মাথা বলেই বিধবা শ্যালিকা জ্ঞানদার চরম সর্বনাশ করেও শাস্তি পান না, গরীব ব্রাহ্মণের দুঃখমোচনের অছিলায় বৃদ্ধ বয়সে ভূরি-ভোজনের আয়োজন করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে দ্বিধা করেন না। এহেন গোলোক চাটুজ্যের কারসাজিতে ব্যর্থ হয়ে গেলো প্রিয়নাথের মেয়ে সন্ধ্যার জীবন। পাড়াগাঁয়ের ছোট রেল স্টেশনে করবী গাছের ছায়ায় যখন এসে দাঁড়ালো তিনজন দুর্ভাগা মানুষ—প্রিয়নাথ, সন্ধ্যা ও জ্ঞানদা—তখন রাত্রির সেই অন্ধকারে নির্মম সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা ধিক্কার-ধ্বনি যে অনুরণিত হয়ে উঠেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্র যে শুধু কাহিনী-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এই ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন তা নয়, তিনি কোনো কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে কিছু জোরালো বক্তব্যও প্রকাশ করেছেন। সাত আগুনে-পোড়া মানুষ কালীতারা, মর্মান্তিক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা। যে তুষের আগুন তাঁর অন্তরে নিয়ত জ্বলেছে সেই দাহেই তিনি একদিন পুত্রবধূ জগদ্ধাত্রীকে বলেছেন—'শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানিনে বৌমা। কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা ত ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ ব্যথা যদি পেতে, ত বুঝতে বৌমা, ছোট জাত বলে মানুষকে ঘৃণা করার শাস্তি ভগবান প্রতিনিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্ছেন। এই যে কুলের মর্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমনভাবে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে মা?' এখানে দুটো ব্যক্তিমানুষের, সন্ধ্যা ও তার প্রেমিক অরুণের, হয়ে হিন্দু সমাজের অনুমোদিত জাত ও কুল বিচারের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অভিযোগ সরাসরি উত্থাপিত হয়েছে।

তবু কালীতারার অজ্ঞানকৃত হলেও কিছু পাপ বা অপরাধ ছিলো। কিন্তু সন্ধ্যা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নিরপরাধ। অথচ সমাজের দণ্ডের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে পথে নেমে আসতে হলো, ব্যর্থ হয়ে গেলো তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই সেই পণ্ড-হওয়া বিয়ের রাত্রিতে অরুণের কাছে ছুটে গিয়ে সে

আর্তনাদ করে উঠেছে—'আমি ত বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে! তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না! উঃ! এত বড় শাস্তি আমাকে তুমি কেন দিলে ভগবান! আমি তোমার কি করেছিলাম!' যে সমাজ তার সর্বনাশের কারণ তারই প্রতিভূরূপে ভগবানের কাছে সন্ধ্যার এই নালিশ ব্যক্তিসত্তার সপক্ষে এক রক্তাক্ত দলিল।

আট

অভাগীর স্বর্গে সমাজের যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে লেখকের তির্যক কটাক্ষ অস্পষ্ট থাকে নি। দুলের মেয়ে বামুন-মার মতো মাথায় সিঁদুর ও পায়ে আল্‌তা পরে এবং ছেলের হাতের আগুন পেয়ে স্বর্গ পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার মৃত্যুর পর মৃতদেহ সংকারের কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে তার বালক পুত্র কাঙালী হিন্দুস্থানী দরওয়ান থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাস মুখুজ্যে পর্যন্ত সকলের কাছে যে ব্যবহার পেলো, তাতেই—সেই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতাতেই— 'সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল।' সেই অভিজ্ঞতা ছোট জাতের দরিদ্র মানুষের প্রতি সমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের শাসন ও শোষণ সম্পর্কে। গল্পটিতে সামাজিক উৎপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

যে সমাজ-ভাবনা অভাগীর স্বর্গে বিবৃত হয়েছে, তা আরও প্রত্যক্ষ ও মারমুখী হয়ে উঠেছে মহেশ গল্পে। এখানে দুলের মেয়ের স্বর্গলাভের মতো অপরিচ্ছন্ন কোনো উপলক্ষ নেই—অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে ঝরে-পড়া খরার আগুন এবং গফুর ও মহেশের পেটের আগুন একাকার হয়ে গিয়ে সামাজিক বঞ্চনার এক নিদারুণ ইতিহাস রচনা করেছে। শরৎচন্দ্র এখানে কোনো অস্পষ্ট উপলক্ষ সৃষ্টি করেন নি— তিনটি প্রাণীর ক্ষুধার সত্যে সমাজের বাস্তবকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের তবু প্রতিবাদের ভাষা আছে, কিন্তু মহেশের মতো অবলা জীবের তাও নেই। তাই তার বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা দুটি গভীর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে গফুর বলেছে— 'তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না!...জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্?' শুধু তাই নয়। মহেশের মৃত্যুর পর রাত্রির অন্ধকারে আমিনার হাত ধরে ফুলবেড়ের চটকলের দিকে যেতে যেতে গফুর ফুঁসে উঠেছে— 'আল্লা! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ

আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।' সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তির এমন ক্রুদ্ধ চীৎকার, এমন খর করতালি শরৎ-সাহিত্যে আর কোথায়ও শোনা যায় নি।

নয়

সুতরাং আমরা দেখলাম, শরৎচন্দ্র যেমন সমাজের পক্ষে তেমনি ব্যক্তির পক্ষে। তিনি একদিকে সমাজ ভেঙে দেওয়ার শ্লোগান তোলেন নি, অন্যদিকে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা দলন করার শ্লোগানও তোলেন নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা আসল সত্য? এ-সম্বন্ধে মোটামুটি তিনটি মত প্রচলিত আছে। একদল বলেন, শরৎচন্দ্র আসলে সমাজেরই পক্ষে। সমাজ যে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য সত্য, এই বিশ্বাস তাঁর আজীবন ছিলো। তবু যে তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তির ক্ষোভ বা বিদ্রোহ দেখা যায় তার কারণ ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি ব্যক্তি-জীবনের কারবারি। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপায় রূপেই শরৎচন্দ্র ব্যক্তির নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার, ক্ষোভ ও বেদনার ছবি আঁকতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি-হৃদয়ের সেইসব কাহিনীতেও সমাজের শৃঙ্খল তিনি একেবারে হাতছাড়া করেন নি— ব্যক্তির বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের মধ্যে ও কৌশলে সামাজিক অঙ্কুশটি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। যে কমল ব্যক্তিতন্ত্রের দুর্ধর্ষ ধ্বজাধারী, বিদ্রোহের শ্লোগান তুলে যার জীবনের পথযাত্রা তারও অস্তিত্বের গভীরে অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে সমাজ-বোধ। তা না হলে যে বিবাহকে একটা সংস্কার মাত্র বলে মনে করে, সে কেন নিরামিষ আহার ও সংযমধর্মের পুরনো মূল্যবোধের কাছে ধরা দেয়? আসলে জীবনের প্রকাশ্য অঙ্গনে যে কিছু-না-মানার তত্ত্ব শোনায়, তার ভেতরের জীবনে পুরনো মূল্যবোধের আকারে সামাজিক সংস্কারকে মেনে চলার গোপন মহড়া চলেছে। এ-কথা শরৎ-সাহিত্যের সব বিদ্রোহিণী সম্পর্কেই অল্পবিস্তর সত্য।

অন্য দল বলেন, শরৎচন্দ্র বস্তুতঃ পক্ষে ব্যক্তিরই ভাষ্যকার। যে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের তিনি লেখক সে-কালে বাংলা সাহিত্যে, বিশ্ব-সাহিত্যে ত বটেই, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের ধারণা ও চেতনা ছড়িয়ে পড়ছিলো। শরৎচন্দ্র সেই কালগত বোধে প্রবুদ্ধ ছিলেন। 'In Burma he saw how the loosening of social bonds brought out not only evil in man but also exquisite human qualities. He also saw how external the social relations

remain for him, they are casual and are discarded on the slightest pretext. The consciousness deepened in him that it is the man that matters, not his social stamp.'[৬] তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজের বেষ্টনী ক্রমাগত শিথিল হয়ে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠালাভ করছে এবং ব্যক্তির সেই প্রতিষ্ঠালাভের মধ্যেই আধুনিক কালের মানুষের সমস্ত রকমের চিন্তা ও উদ্যোগ নিহিত হতে চলেছে। তাই শরৎ-সাহিত্য ব্যক্তিত্বের জয়গানে মুখর। তবু যে তিনি সমাজের ওপর ভাঙনের হাতুড়ি চালান নি, তার কারণ তাঁর লেখক হিসেবে দুর্বলতা। চরম মুহূর্তে তিনি দ্বিধার শিকার হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর বোধ হয় এই ধারণা হয়েছিলো যে, বাঙালি পাঠক ব্যক্তির ব্যর্থতায় যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন সমাজ-ভাঙার পালায় শেষ পর্যন্ত অংশীদার হবে না। তাই জনপ্রিয়তার দাসত্ব তিনি করেছেন অন্তিম ক্ষণে পেছিয়ে আসার মূল্যে।

তৃতীয় দলের বক্তব্য, শরৎচন্দ্র কার্যতঃ সঙ্কটাপন্ন লেখক, সমাজ ও ব্যক্তির সংঘর্ষে দ্বিধার শিকার। তিনি কোনো স্থির প্রত্যয়ে পৌছাতে পারেন নি—একদিকে জেনেছেন আমাদের সমাজের গভীর অসুখ, তার স্থিতাবস্থায় ফাটল দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে আবার ব্যক্তির সৃজনশীল আত্মপ্রকাশের নিরন্তর প্রয়াস দেখেছেন, দেখেছেন তার স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্যের নানা আয়োজন। ফলে একটা স্ব-বিরোধ তাঁর চিন্তার ও সৃষ্টির মধ্যে থেকে গেছে। আসলে এই কুণ্ঠা ও সংশয় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তিনি—তার মধ্যেই ছিলো। তাঁরা যেমন কালের নতুন পুতুলে আকৃষ্ট হয়েছেন, তেমন প্রাক্কালের পুরনো কেল্লার মোহ ছাড়তে পারেন নি। শরৎচন্দ্রেও এই দ্বিধাবিভক্ততার লক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে নি। তা না হলে একালের মেয়ে কিরণময়ী—যার বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা ও ব্যক্তিত্বের প্রখরতা উজ্জ্বল—তাকে এমন পরাভূত শক্তিরূপে উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা পাশে দেখা যেতো না। এই কারণে তৃতীয় দল শরৎচন্দ্রের মতামত সম্পর্কে কোনো একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে থাকেন।

দশ

এ হেন পরিস্থিতিতে বিমূঢ় হওয়ার কথা, সত্যে পৌছোনোর চেষ্টা বিড়ম্বনার নামান্তর। তবু আমার বক্তব্য স্পষ্ট করেই নিবেদন করছি। প্রথমেই একথা

৬. H. Kabir, Saratchandra Chatterjee, p. 56.

স্বীকার করে নিচ্ছি যে, শরৎ-সাহিত্যে বুদ্ধির কাজ স্বচ্ছ নয়। তাঁর চিন্তাগুলি অনেকক্ষেত্রেই জট-পাকানো। বিশ্বাসের যে আলোকবিন্দুতে বক্তব্য সংহত হয়ে আসে তার জরুরি সূত্রটি শরৎচন্দ্র অগোছালো করে রেখেছেন। গল্পপ্রিয় বাঙালি পাঠককে গল্প-শোনানোর মোহে তিনি এতই আচ্ছন্ন যে, বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতায় তিনি মনোযোগী হতে পারেন নি। তবু এরই মধ্যে তাঁর আসল মতটি ধরবার চেষ্টা করা যাক্।

মানুষের স্পৃহা ও প্রবণতার নানারকমের তাত্ত্বিক বিচার এ যাবৎ হয়ে এসেছে। ভাববাদী দর্শনের মতে মানুষ সব রকমের জড়ধর্মী সামাজিক সম্পর্ক এবং বাহ্য অধ্যাত্মনীতি থেকে অপরিহার্যভাবে মুক্ত। তার একটা স্বাধীন পরম মূল্য আছে। মানুষের সেই স্বাধীন স্বয়ংবৃত সত্তার অনুধ্যানের ওপর আজ দাঁড়িয়েছে অস্তিবাদী দর্শন ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব। এ-সম্পর্কে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—…'according to the existentialist credo real man is the individual man free from all social ties. The existentialists also accord man an independent absolute value, which is the greater the freer he is from society, from existing social relations and ties. The supporters of the psychological trend in sociology, particularly the Freudians, also build their arbitrary theories of man on this subjective-idealist foundation.'[৭] এই মন্তব্যে অস্তিবাদী দর্শন ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ভিত্তি যথার্থই সন্ধান করা হয়েছে, যদিও 'arbitrary' শব্দের তির্যকতা সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে।

শরৎচন্দ্র মানুষের এই স্বাধীন মুক্ত নিঃসঙ্গ সত্তাকে যে যথাসম্ভব দেখেছিলেন তা আমরা প্রথম ও তৃতীয় বক্তৃতায় ('নিরাশ্রয়তাবোধ' ও 'যৌনতাবোধ') লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি, তিনি মানুষের যে দুটি রূপ মুখ্যতঃ জেনেছিলেন তার মধ্যে একটিতে পাই সেই সব মানুষকে যারা সমাজের অন্তেবাসী, সমাজ-বেষ্টনীর শেষ সীমায় বিচরণকারী ছন্নছাড়া, নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি মাত্র। দৈনন্দিন জীবনের কঠোর বিধিবিধান থেকে বিচ্ছিন্ন সেই ব্যক্তি-মানুষগুলিকে তিনি দেখেছিলেন অস্তিবাদী দর্শনের মতো কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টির প্রণোদনা নিয়ে নয়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তবু সামাজিক সম্পর্কচ্যুত, মুক্ত সেই সব ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠাকামিতা ও স্বাধীন মূল্যার্জন-

৭. M. Petrosyan, Humanism, p. 169.

প্রচেষ্টা অস্তিবাদী দর্শনোক্ত মানববীক্ষণের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া শরৎচন্দ্র আদিম্বভাবের আলোকেও মানুষকে চিনতে চেয়েছেন। যে যৌনতা প্রকৃতির ধর্ম, নরনারীর মূল সম্বন্ধের বিষয়—যে দুর্বার আদিম প্রবৃত্তি শরীরকে আশ্রয় করে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে চায়—তাকে Sophistication ও সমাজনীতির আড়াল থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিসত্তার পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত করার সাহসিক চেষ্টা শরৎ-সাহিত্যে বিরল নয়। আপন রুচির বাধা সত্ত্বেও তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীন মিলনতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, বিবাহিত জীবনের সীমার মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে ব্যক্তিগত জৈব প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্যতাকে অবৈধ মিলনের মধ্যে রূপ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের প্রখর যৌনজিজ্ঞাসার সেই সব বিরল দৃষ্টান্তগুলিতে মানুষকে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের আওতা থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিসত্তার স্বভাবমূল্যের ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা লক্ষণীয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে সামাজিক সম্পর্কধারা ও বন্ধনগুচ্ছ থেকে ব্যক্তির মুক্তির যে চেহারা নির্ধারিত, শরৎচন্দ্র কোনো কোনো যৌনচিত্রে সেই চেহারাটাকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের 'autonomy বা sovereign nature'-এর একটা ধারণা আমরা এ থেকে পেতে পারি।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে এই ব্যক্তিদর্শনেরও একটা সীমা আছে। তিনি বুদ্ধির উপার্জন কিংবা শিক্ষিত মনের উপলব্ধি হিসেবে ব্যক্তির স্বাধিকারবোধের তত্ত্বটাকে ততটা পান নি যতটা পেয়েছেন জীবন সম্পর্কে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার পুঁজি হিসেবে। যেহেতু পাশ্চাত্ত্য সমাজে ব্যক্তির লড়াইয়ের তিনি নিয়ত দর্শক ছিলেন না সেই হেতু ব্যক্তিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকামিতা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতারও একটা সীমা ছিলো। আর যাঁরা ব্যক্তিতন্ত্রের দার্শনিক—বুদ্ধির মঞ্চচূড়ায় বসে ব্যক্তিত্বের অপ্রতিহত গতির ভাষ্য রচনা করেন— শরৎচন্দ্রকে তাঁদের সঙ্গে এক করে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ব্যক্তিতন্ত্রের নিরঙ্কুশ উপাসকরা সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তিত নন, সমষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নটিও তাঁদের কাছে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র মানুষকে ভালোবাসতেন, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় মানুষের প্রতিই তাঁর দরদ ছিলো গভীর। তাঁর মানসবৃত্তে মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নটিও নিয়ত জীবিত ছিলো। তাই ব্যক্তিতন্ত্রের ঘোড়দৌড়ে কোনো বেড়া তিনি মানবেন না, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি তাঁর কাছে আমরা আশা করতে পারি না। তা ছাড়া এটাও তিনি জানতেন, প্রাচ্যখণ্ড কম-বেশি সমাজ শাসিত— কালক্রমে তা যতই শিথিল হোক, তা দূরীকরণযোগ্য খোলস মাত্র নয়। ফলে

শরৎচন্দ্রে ব্যক্তির আস্ফালন সর্বত্রই একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ— তা কোথায়ও লাগাম-ছেঁড়া নয়। তাই বুদ্ধিশালিনী ও ব্যক্তিত্ববাদিনী কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, অজিতকে দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে আড়ালে রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্তিবাদের মূর্তিমতী কমলকে দিতে হয়। এমন আরও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র ব্যক্তিতন্ত্রের উপাসক ছিলেন বটে— কিন্তু ঠিক ততটা পর্যন্তই যতক্ষণ না সমাজের ভাঙনের গুরুতর সমস্যা উঠছে। ব্যক্তিগত রুচির দিক থেকেও এ-বিষয়ে একটা চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকার চেষ্টা তিনি করেছেন।

এগারো

এবার শরৎচন্দ্রের সমাজদর্শনের দিকটা বিচার করা যাক্। ভাববাদী দর্শনে যেখানে ব্যক্তির ওপর জোর, জড়বাদী দর্শনে সেখানে জোরটা সরে এসেছে সমাজের ওপর। সকল প্রকার সামাজিক বন্ধনপাশ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিসত্তাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা এক পক্ষের অভিপ্রায়, অন্য পক্ষের অভিপ্রায় ব্যক্তিকে সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। ব্যক্তি সেখানে সামাজিক সম্পর্কহীন একটা স্বাধীন সত্তা বা ইউনিট মাত্র নয়, সে যে অবস্থার মধ্যে বাস করে ও বাস্তব বিধির মধ্যে বিকশিত হয় তারই অধীন। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের জীবনে সে যে সত্যিকারের ভূমিকা পালন করে, মানুষের ও সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতিতে যে 'অবদান' যোগায় তারই মূল্যে ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তা আসলে ইতিহাসের প্রক্রিয়া বা ক্রমাগ্রসরণের সক্রিয় অঙ্গ মাত্র। তাই বলা হয়েছে— 'Man is a social being. This is his distinguishing feature. He is an organic part of society. This being so, the criterion of a person's value must be sought in the sphere of social relations, in the sphere that determines man's essence.'[৮] সামাজিক দিক থেকে দরকারি কার্যকলাপের ভিত্তিতে ব্যক্তিমানুষকে বিচার করার এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির চেয়ে সমাজের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়।

শরৎচন্দ্র সমাজকে মানতেন ঠিকই, কিন্তু তাকে ভেঙেচুরে ব্যক্তিকে একেবারে

৮. M. Petrosyan, Humanism, p. 170.

স্বাধীন করে দেওয়ার তত্ত্বে তিনি আস্থা স্থাপন করেন নি, এটাও ঠিক। সমাজ জিনিসটাকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন স্থূলভাবে। 'সমাজধর্মের মূল্যে' তিনি কোনো সূক্ষ্মতার মধ্যে যান নি, একথা তাঁর মুখেই শুনেছি। সাধারণতঃ সমাজের সঙ্গে একজন ব্যক্তির সম্পর্ক— ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, অর্থগত ইত্যাদি নানা রকমের। সেই সম্পর্কগুলির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস এগিয়ে যায়। কোনো পরিচ্ছন্ন তত্ত্ববুদ্ধি না থাকলেও শুধু হৃদয়ের আবেগ দিয়ে সেই-সম্পর্কগুলির রূপ ও চরিত্র ঠিক স্পষ্টভাবে বোঝা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। শরৎচন্দ্র মূলতঃ ছিলেন আবেগধর্মী লেখক, জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতার সূত্রে সাধারণভাবে একটা সমাজ-চেতনা লাভ করলেও সমাজের বিচিত্র জটগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখার মতো বুদ্ধির প্রয়োগ শরৎ-সাহিত্যে দেখা যায় না। অভাগীর স্বর্গে অভাগীর স্বর্গকামনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বলে দরিদ্র দুলে-পরিবারের শাসিত ও শোষিত রূপটির আবেগবর্জিত প্রখর চিত্র উত্থাপিত হতে পারে নি। এমন কি মহেশেও গফুরের একটি অবলা জীবনের প্রতি গভীর মমতার সহৃদয় উপাখ্যান যতটা বিবৃত হয়েছে, জমিদার ও তর্করত্ন-শাসিত সমাজের সঙ্গে দরিদ্র মুসলমানটির জড় সম্পর্ক ততটা ব্যাখ্যাত হয় নি। তাছাড়া মাথা নিচু করেই কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ জীবন থেকে চটকলের শিল্পকেন্দ্রে যাত্রা করেছে গফুর। তবুও এই গল্পটিতে ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের আভাস এবং তাতে একটি ব্যক্তি-মানুষের ভূমিকার কথা আছে, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। দ্বিজদাস তো আরম্ভে মিছিলের পতাকা উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বন্দনার আঁচলের তলায় স্বস্তি লাভ করে মুখুজ্যে পরিবারের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছে। এ তো পিছু-হটার কাহিনী। দেনাপাওনায় গ্রামের জমি গিয়ে পৌঁছেছে চিনিকলের মালিকের কাছে। এই নিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের যে ইতিবৃত্ত রচিত হতে পারতো তার বদলে শরৎচন্দ্র আমাদের উপহার দিলেন অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর কাছে প্রতিবাদকারিণী 'ষোড়শী ভৈরবীর' আত্মসমর্পণের কাহিনী। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কাছে পরাজিত হলো সমাজপ্রগতি। পল্লীসমাজের রমেশের মানুষ ও সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগমনে একটা ভূমিকা ছিলো বটে, কিন্তু বড়দিদির সুরেন্দ্র, পরিণীতার শেখর, দেবদাসের দেবদাস, চরিত্রহীনের সতীশ, দত্তার নরেন, গৃহদাহের মহিম-সুরেশ, পথের দাবীর অপূর্ব ইত্যাদিকে কোনোমতেই ইতিহাসের সক্রিয় অঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এরা ব্যক্তিচরিত্র মাত্র—নিজেদের সুখ-দুঃখের চাকায় নিত্য ঘূর্ণায়মান। কেউ হয়ত বলতে পারেন, এরা নিজ নিজ

কক্ষপথে পরিক্রমা করতে করতেই সমাজে এনেছে নানা পরিবর্তন। কিন্তু এই মানুষগুলির শ্রেণীচরিত্র এত অস্পষ্ট ও দূরগত যে সামাজিক দিক থেকে তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না—অন্ততঃ জড়বাদী দর্শনে যে অর্থে ব্যক্তি-চরিত্রকে সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিহাসের প্রক্রিয়ার অংশ বলে বিবেচনা করা হয় সেই অর্থে নয়। আসলে তা শরৎচন্দ্রের সচেতন মনের উদ্দিষ্টই ছিলো না, ফলে চরিত্রগুলির মধ্যেও নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট চেতনা নেই। শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে রুশ সাহিত্যের কথা জানতেন, কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শন পড়েছিলেন কি না তার কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। আমার ধারণা, তিনি সমাজবাদ বা সাম্যবাদের স্থূল কথাগুলি জানলেও জড়বাদী দর্শনের গভীর তত্ত্বের সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিলেন না। তাই এই দর্শনের ইতিহাস-ব্যাখ্যা, ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ইতিহাস-বিচার ইত্যাদি দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না তাই তাঁর সমাজচেতনা তাঁর গভীরতর সমাজদর্শনের পরিচয় বহন করে না। তাঁর সাহিত্যে সমাজ ততটা সর্বাত্মক গুরুত্ব পায় নি।

বার

এবার এ-সম্পর্কে আমার অভিমত আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করছি। শরৎচন্দ্র আসলে সমাজ কিংবা ব্যক্তি, কোনো পক্ষেই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন নি। তাঁর সাহিত্যগত বক্তব্যে চূড়ান্ত একদেশদর্শিতার সাক্ষ্য নেই। তিনি সমাজ মানতেন, কিন্তু তাকে দেবতা বলে মানতেন না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সমাজ তাঁর চোখে অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্য ছিলো না, ছিলো না নির্বিচারের পূজ্য পবিত্র সত্তা। তার কারণ—'বহুদিনের পুঞ্জীভূত নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে।'[৯] আর ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষাকেও তিনি সম্মান করতেন, কিন্তু যথেচ্ছচারিতাকে নয়। তিনি একদিকে যেমন ব্যক্তির মুক্তিতে বহু সদগুণের স্ফূর্তি দেখেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তার ভেতর দিয়ে মহতী বিনষ্টিও দেখেছিলেন। এতে সমষ্টি ও ব্যক্তি উভয়েরই অকল্যাণ। তাই শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিদর্শন কোথায়ও তুঙ্গী হয়ে ওঠে নি।

৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, অষ্টম সম্ভার।

এই থেকে আমাদের আর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয়। শরৎচন্দ্র আসলে সমাজ কিংবা ব্যক্তি কোনো একটার সর্বাত্মকতার তত্ত্বে নয়, তাদের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর বক্তব্য ছিলো, কালের তাগিদ ও ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সমাজকে বদলাতে হবে, রদবদল ঘটাতে হবে। অপরপক্ষে ব্যক্তিকেও একথা কথা মেনে নিতে হবে যে, সমাজ আছে এবং থাকবে। সুতরাং ব্যক্তির ন্যায্য দাবিও এমন পর্যায়ে তোলা উচিত নয় যাতে সামাজিক সংগঠন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাতে সমষ্টির অমঙ্গল এবং অন্তিম বিচারে ব্যক্তিরও অমঙ্গল। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, এই দুইয়ের মধ্যে কালানুক্রমিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। যদি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ অভিপ্রেত হয় তবে পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেখানে তা হচ্ছে না, সেখানে একের বিরুদ্ধে অপরের ক্ষোভ থাকবেই। অভয়া বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু সমাজ ছাড়তে চায় নি। এর সুন্দর সমাধান ছিলো বিদ্রোহ ও সমাজবোধের সঙ্গত সামঞ্জস্যের মধ্যে। অভয়ারও তা-ই মনের কথা—'সংসারে সব নরনারীই এক ছাঁচে তৈরী নয়, তাদের সার্থক হওয়ার পথও শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।' শুধু অভয়ার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটাই শরৎচন্দ্রের আসল বক্তব্য বলে মনে করি; যদিও সর্বত্র তা পরিচ্ছন্ন ভাবে উত্থাপিত হয় নি।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি ও সমাজের অবিরাম সামঞ্জস্যের তত্ত্ব বিচার করতে গিয়ে একজন আধুনিক চিন্তাবিদের একটি উক্তি মনে পড়ছে—If we are to study conduct, we must follow it in both directions : into the duties of men, which alone hold a society together and also into the freedom to act personally which the society must still allow its men. The freedom of values arises only when men try to fit together their need to be social animals with their need to be free men.[১০] একথা স্মরণ রাখলে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত শরৎচন্দ্রের চিন্তাকেও যুক্তিসম্মত আধুনিক বলে মনে হবে।